HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০১ সমাজের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সমাজের ধারণা
টপিক ০২: সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী
টপিক ০৩: সমাজ বিবর্তনের ধারা
টপিক ০৪: সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ
টপিক ০৫: বিভিন্ন সমাজের তুলনা
টপিক ০৬: সংস্কৃতির ধারণা
টপিক ০৭: সভ্যতার ধারণা
টপিক ০৮: সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক
টপিক ০৯: সংস্কৃতির ধরণ
টপিক ১০: সামাজিক দল বা গোষ্ঠী
টপিক ১১: গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সংঘ
টপিক ১৩: সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক
টপিক ১৪: সমাজ ও সম্প্রদায়
টপিক ১৫: প্রতিষ্ঠানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ১৬: প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ
টপিক ১৭: লোকাচার ও লোকরীতি
টপিক ১৮: সামাজিক গতিশীলতা
টপিক ১৯: সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ
টপিক ২০: সামাজিক নিয়ন্ত্রনের ধারণা
টপিক ২১: সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ
টপিক ২২: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ২৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সমাজের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ। বাংলা 'সমাজ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Society। ল্যাটিন শব্দ 'Socious' থেকে Society শব্দটি এসেছে, যার অর্থ পারস্পরিক বন্ধুত্ব বা সহযোগিতা। অতএব সমাজ বলতে সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়। অর্থাৎ যখন বহু লোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। সাধারণত সমাজ বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়। যখন কিছু লোক কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। সমাজ একটি মানবীয় সংগঠন। আকারের দিক থেকেও এটি বৃহৎ প্রকৃতির। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে সমাজকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট তাঁর 'Fundamentals of Sociology' গ্রন্থে বলেছেন, "Society means the term of social relationship, by which relationship each man is related with his companion." (সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত)।

সমাজের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার-এর মতে, সমাজ অর্থ সহযোগিতা। ম্যাকাইভারের এ ধারণাটি মার্কসীয় ধারণায় সর্বদাই ঠিক নয়। যেমন- পুঁজিবাদী সমাজে সহযোগিতার বিপরীত অবস্থায় শ্রেণি সংঘাত রয়েছে বলে মার্কসীয় মতবাদে উল্লেখ করা হয়। অতএব সমাজ বলতে সহযোগিতা এবং সংঘাত উভয়কেই বুঝতে হবে। কারণ সমাজের মধ্যে একই সঙ্গে মিলন-বিরোধ বর্তমান থাকতে পারে। ম্যাকাইভার আরও বলেন, "Society is wave of social relationships and it is always changing." (সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের একটি ধারা এবং এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল)।

ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver and Page) তাদের Society গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের প্রণালী বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা বাস করি। তারা আরও বলেন, সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জালবিশেষ বা সদা পরিবর্তনশীল।

সমাজবিজ্ঞানী R. T. Schaefer তাঁর 'Sociology' (1983:545) নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Society is fairly a large number of people who live in the same territory, are relatively independent of people outside their area, and participate in a common culture." (সমাজ হচ্ছে এমন একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা একই এলাকায় বসবাস করে, যারা তাদের এলাকার বাইরের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন এবং যারা একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে)।

সমাজের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী D. Popenoe তাঁর 'Sociology' (1986:583) নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Society is a comprehensive social grouping that includes all the social institutions required to meet basic human needs." (সমাজ হচ্ছে এমন একটি ব্যাপক সামাজিক গোষ্ঠী যা মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সব সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলফ্রেড এ. রোজ বলেন, "সমাজ হলো সেই ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যাদের পরস্পরের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগাযোগ এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাধারণ কৃষ্টিও বিদ্যমান রয়েছে।"

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস-এর মতে, ‘‘সমাজ হলো সাধারণত স্বার্থপ্রণোদিত এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যরা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য পরস্পরের সহযোগিতা করে।"

জে. এইচ ফিচার (Fitcher) -এর মতে, সমাজ হলো একই সাধারণ সংস্কৃতির অংশীদার এবং নিজ সামাজিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুসংখ্যক মানব সন্তানের সমষ্টি।

জিন্সবার্গ (Ginsberg) তার Sociology গ্রন্থে বলেন, মানুষের সাথে মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, সংগঠিত ও অসংগঠিত, সচেতন বা অসচেতন, সহযোগিতামূলক বা দ্বন্দ্বমূলক সব সম্পর্কই হলো সমাজ।

সমাজের ধারণা

বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের জনক অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিমের (Nazmul Karim) মতানুসারে, সমাজবিজ্ঞানিগণ যেসব অর্থে সমাজ প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে সমাজ সম্পর্কিত তিনটি ধারণা পাওয়া যায়। যথা-

(ক) সমাজ হলো কতকগুলো অনুভূতিসম্পন্ন সমজাতীয় জীবের সমষ্টি, যারা পরস্পর মানসিক সূত্রে আবদ্ধ। এ অর্থে সমাজ কেবল মানুষের নয়, যেকোনো জীব প্রজাতিরও হতে পারে।

(খ) সমাজ অর্থ সমাজের কাজ। এক্ষেত্রে যেসব কাজের মাধ্যমে সমাজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় তার আধারস্বরূপ যে সমস্ত সংঘ বিদ্যমান, সমাজ বলতে তাকেই বুঝিয়ে থাকে। যদিও সমাজের কাজই মুখ্য বিষয়, সংঘ নয়।

(গ) সমাজ বলতে সামাজিক কার্যাবলির সমষ্টিকে বোঝায়।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফার্ডিন্যান্ড টনিস মনে করেন, "Society is a system of social relationship in and through which we live." (যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা জীবনযাপন করি তাদের সুসংগঠিত রূপই সমাজ।)

সমাজের ধারণা

অতএব সমাজ বলতে বোঝায় পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সম্পর্কের সুবিন্যাস। যেখানে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অন্যকথায় পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ বা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ারত এমন জনগোষ্ঠীর নাম সমাজ যারা গড়ে তোলে তাদের নিজস্ব প্রথা ও জীবনযাত্রা প্রণালি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০১ সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

টপিক ০২: সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

সমাজের বৈশিষ্ট্য

সাধারণত প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা তাকে সমাজ বলতে পারি। প্রথমত, বহু লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস। দ্বিতীয়ত, এ সংঘবদ্ধতার পিছনে কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থাকা। এছাড়া সমাজের আরও বেশকিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজের এসব বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি নিম্নরূপ-

১. সমাজ মাত্রেরই একটি নিজস্ব সংগঠন ও সংহতি আছে। সমাজের মধ্যে সাম্য ও সংহতি বিরাজ করে, মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক সংগঠন ও সংহতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

২. সমাজ স্থিতিশীল নয়, সমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল।

৩.পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গঠিত।

৪. সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।

৫. সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের সমভাবাপন্ন মনের ওপর।

৬. সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ ও গোষ্ঠীভেদ থাকে।

৭. সামাজিক সংস্থা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সবকিছুই ধীরে ধীরে বিভিন্ন কালের মানুষের অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে ওঠে। সেগুলোর আবার পরিবর্তনও সাধিত হয়।

সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

সমাজের বৈশিষ্ট্য

৮. সমাজ ও ব্যক্তিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ বা সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিকে কল্পনাই করা যায় না।

৯. সমাজ এমন একটি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করে যাকে অনুভব করা যায়।

১০. সমাজ একটি বৃহৎ মানবীয় সংগঠন।

১১. সমাজের সদস্যবৃন্দ পরস্পর নির্ভরশীল এবং পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত।

১২. সমাজ হলো অভিন্ন অনুভূতিক্ষম সমজাতীয় প্রাণীর সমষ্টি।

১৩. সমাজ হলো একটি সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালি।

১৪. সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সব সমাজেই বিদ্যমান। তবে দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ী। কেননা প্রতিটি সমাজে সহযোগিতার প্রাধান্য বেশি। যার ফলে বিরোধ কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

১৫. সমাজ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের জটিল জালস্বরূপ।

১৬. সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সবরকম সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করে একটি সুন্দর সমাজ গঠন করা।

সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

সমাজের কার্যাবলী

সমাজের কার্যাবলি বহুবিধ। নিচে সমাজের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

১. সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষ একে অপরের সাথে সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সমাজস্থ সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি করা সমাজের মুখ্য কাজ।

২. এককভাবে কারও পক্ষে ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। সমাজবদ্ধ হয়ে সকলের প্রচেষ্টায় মানুষ ভালো কাজ করতে পারে।

৩. সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করা সমাজের কাজ।

৪.সমাজের অন্যতম কাজ হলো দক্ষতার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে এর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা। এজন্য নানা প্রকার কর্মপদ্ধতি, প্রচারণা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

৫.ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমাজ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শুধু সামাজিকীকরণ নয়, তাদের মধ্যে উন্নতি বিধান এবং বিশেষ কোনো মতবাদে দীক্ষাদান সমাজের মূল কাজ।

৬. সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান করা সমাজের কাজ। নিজেদের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-কলহ অবসান করাও সমাজের কাজ।

সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

সমাজের কার্যাবলী

৭.ধর্মভিত্তিক সমাজের সদস্যদের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে নজর রাখা।

৮. সমাজস্থ সদস্যদের আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

৯. মানবজীবনের চাহিদা সীমাহীন। সমাজ মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিকসহ সব রকম বৈধ চাহিদা পূরণে সহায়তা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০৩ সমাজ বিবর্তনের ধারা

টপিক ০৩: সমাজ বিবর্তনের ধারা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজ বিবর্তনের ধারা

সমাজের উৎপত্তি

সমাজের উৎপত্তি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। হঠাৎ করে কিংবা একদিনে সমাজের উদ্ভব হয়নি। তবে সমাজ উদ্ভবের কারণ এবং সময় নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। বাস্তবিকপক্ষে সমাজের উৎপত্তির ইতিহাস মানবজাতির উদ্ভবের সাথে একান্তভাবে জড়িত। সমাজের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন মতবাদ লক্ষ করি। সমাজ উৎপত্তির একটি প্রাচীন মতবাদ হলো ঐশ্বরিক মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে সমাজ হলো ঈশ্বরের সৃষ্টি। বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী, প্রাণহীন বস্তু যা কিছু আছে সবকিছু একমাত্র ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মতো সমাজও ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। কালক্রমে বিভিন্ন ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনার বিকাশের ফলে এ মতবাদ অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়। কারণ ঐশ্বরিক মতবাদ ক্রমবিকাশের যুক্তির বিচারে নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি।

সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কিত আঙ্গিক মতবাদের উৎস বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান। এ সাহিত্যে সমাজকে একটি বৃহদাকার প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান ও ভূমিকার সাথে সমাজদেহের চতুর্বর্ণের অবস্থান ও ভূমিকা তুলনীয়। মানবসমাজের আঙ্গিক মতবাদ অনুসারে সমাজদেহের অঙ্গসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ বিবর্তনের ধারা

সমাজের উৎপত্তি

সমাজ উৎপত্তির বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুসারে শক্তি বা বলপ্রয়োগই হলো সমাজ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। আদিম সমাজব্যবস্থায় বলবান ব্যক্তি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত। এ শক্তিমান ব্যক্তির অধীনে সমাজের অন্যরা সংগঠিত হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হতো। ফলে বলবান ব্যক্তির বলপ্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সমাজ। তাই বলপ্রয়োগকেই সমাজ সৃষ্টির একমাত্র কারণ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু কালক্রমে এ মতবাদটিও সমাজের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে পারেনি।

হেনরী মেইন প্রমুখ চিন্তাবিদ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তা। সমাজ উৎপত্তির এ মতবাদে মনে করা হয়, মানব পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে গড়ে ওঠে সমাজ। তাদের মতানুসারে সমাজ হলো পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ। পিতামাতা সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবারের বৃদ্ধি সাধন করে। আর এ বৃদ্ধির ধারায় গড়ে ওঠে সমাজ।

সমাজ উৎপত্তির সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে সমাজ হলো মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফল। মানুষ তার জীবনধারায় অনুভূত কতিপয় প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সমাজের সৃষ্টি করেছে। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সমাজের পূর্বে আর সমাজ সৃষ্টি করেছে মানুষ। সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা হলেন রুশো। সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা টমাস হব্স বলেন, সমাজ সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে বাস করত।

সমাজ বিবর্তনের ধারা

সমাজের উৎপত্তি

সর্বজনগ্রাহ্য ও যৌক্তিক মতামত হলো সমাজের উৎপত্তি হয়েছে ক্রমবিবর্তনের ধারায় এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। মানবজাতির উৎপত্তির সাথে মানবসমাজের উদ্ভব একান্তভাবে জড়িত। সমাজপ্রবণতা হলো মানুষের জন্মগত প্রকৃতি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে মানবশিশুর কাছে সমাজের অস্তিত্ব একটি চরম সত্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করে মানবসমাজ আধুনিককালে এক বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ মনে করেন, সমাজ একদিনের সৃষ্ট নয়; বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে সমাজের রূপ নতুনত্ব লাভ করেছে। তিনি তার 'Course de Philosophy' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সমাজ তিনটি স্তরভেদ করে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানী সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কারণ খুঁজতে গিয়ে ডারউইনের বিবর্তন মতবাদকে সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার, মর্গান ও টেলরের নাম উল্লেখ করা যায়। হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন, সমাজের সংগঠন অসামঞ্জস্য থেকে সামঞ্জস্যতার মধ্যে, জটিলতার মধ্য থেকে শৃঙ্খলার মধ্যে ক্রমান্বয়ে আসছে; যার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিরাজমান রয়েছে এবং তাদের একটির সাথে অপরটি স্থায়িভাবে সংযুক্ত। অসামঞ্জস্য ও জটিলতার মধ্য থেকে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার যে ধারণা জেগেছে, তা হচ্ছে একতা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনে।

সমাজ বিবর্তনের ধারা

অভিন্ন ধারা

সমাজ বিবর্তনের ধারা প্রগতিমুখী এবং একই ধারায় সম্পন্ন হয়। এ ধারা অনুসারী কোভালেভস্কির মতে, মানব সমাজ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সর্বশেষে গণতান্ত্রিক স্তরে এসে পৌছাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে আদিম সমাজ হলো মাতৃপ্রধান সমাজ। পরবর্তীতে তা ধীরে ধীরে পিতৃপ্রধান সমাজে পরিণত হয়। আর এ পিতৃপ্রধান সমাজ কালের পরিবর্তে সামন্ত সমাজে রূপলাভ করে। এ সামন্ত সমাজ ভেঙে সাম্য ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সমাজ বিবর্তনের ধারা

রৈখিক ধারা

একটি রেখাকে সোজাপথ সামাজিক পরিবর্তন অনুসরণ করে সমাজ বিবর্তনের রৈখিক ধারা অনুযায়ী। এ ধারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অগাস্ট কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, কার্ল মার্কসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, সমাজ প্রথমে ছিল ধর্মীয় যুগে, তারপর দার্শনিক যুগে এবং সর্বশেষে প্রকৃতির যুগে বা দৃষ্টবাদের যুগে এসে পৌঁছায়। এভাবে তিনি সমাজ ও মানুষের স্তরভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজের বিবর্তনকে তুলে ধরেছেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, সমাজ ক্রমান্বয়ে অসামঞ্জস্য থেকে সামঞ্জস্যতায় এবং জটিল থেকে শৃঙ্খলতায় চলে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আদিম যুগে সমাজে বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করত। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তন হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে। মূলত তিনি সমাজের বিবর্তন বলতে সমাজের ক্রমশ উন্নতির কথা বলেছেন।

কার্ল মার্কসের নিকট সমাজ পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি এবং শ্রেণিসম্পর্ক। তার মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রেণি সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে এবং এ পরিবর্তনের পিছনে শ্রেণি সংঘাত ক্রিয়াশীল। মার্কস সমাজব্যবস্থার চারটি ধাপের কথা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করেছেন। যথা-ক. এশিয়াটিক; খ. প্রাচীন; গ. সামন্ত যুগ ঘ. পুঁজিবাদ যুগ। মানত করবেন। আর আনে

সমাজ বিবর্তনের ধারা

চক্রাকার ধারা

সামাজিক বিবর্তন মূলত চক্রাকার ধারায় আবর্তিত হয়। বিশেষ কতকগুলো স্তর অতিক্রম করে চরমে পৌঁছানোর পর আবার ধাবিত হয়ে ফিরে আসে আগের জায়গায়। অর্থাৎ সমাজ ও সভ্যতা এ ধারা অনুযায়ী চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

ভিলফ্রেডো প্যারেটো (Vilfredo Pareto)-এর মতে, সমাজ বিবর্তনের ধারায় সমাজ পরিবর্তন হয় রাজনৈতিক স্তরের মধ্য দিয়ে চক্রাকারের ধারা অনুসারে। তিনি আরও বলেন, সমাজবাদী সবসময় দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকে। একটি শাসকশ্রেণি অপরটি শাসিতশ্রেণি। শাসকশ্রেণি বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী হয়। পরবর্তীতে তারা যখন অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের ধ্বংস ঘটে। অপরপক্ষে শাসিত শ্রেণি তখন উন্নতমানের গুণ অর্জনে সক্ষম হয় এবং শাসকশ্রেণিভুক্ত হওয়ার জন্য সমস্ত উপযুক্ততা অর্জনপূর্বক শাসকশ্রেণির স্থান দখল করে। এভাবে সামাজিক বিবর্তনের ধারায় চক্রাকারে সমাজ পরিবর্তন হয়ে আজকের রূপ লাভ করেছে।

সমাজ বিবর্তনের ধারা

চক্রাকার ধারা

পিতিরিম সরোকিন (Pitirim Sorokin) তার 'Social and Cultural Dynamics' নামক গ্রন্থে তিনটি সাংস্কৃতিক রূপ কাঠামোর কথা উল্লেখ করেন। যথা- (i) Ideational; (ii) Idealist 6 (iii) Senate.

সমাজবিজ্ঞানী Anthony Giddens (এন্থনি গিডেন্স) সমাজকে বিভক্ত করেছেন কয়েকটি ভাগে। যেমন- ক্ষুদ্র সংঘবদ্ধ সমাজ, স্থায়ী কৃষিভিত্তিক সমাজ, সাম্রাজ্যবাদ সমাজ, নগরভিত্তিক সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এভাবে পর্যায়ক্রমে সমাজ বিবর্তনের ধারায় সমাজ পরিবর্তিত রূপ লাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০৪ সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

টপিক ০৪: সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

This Topic is important for

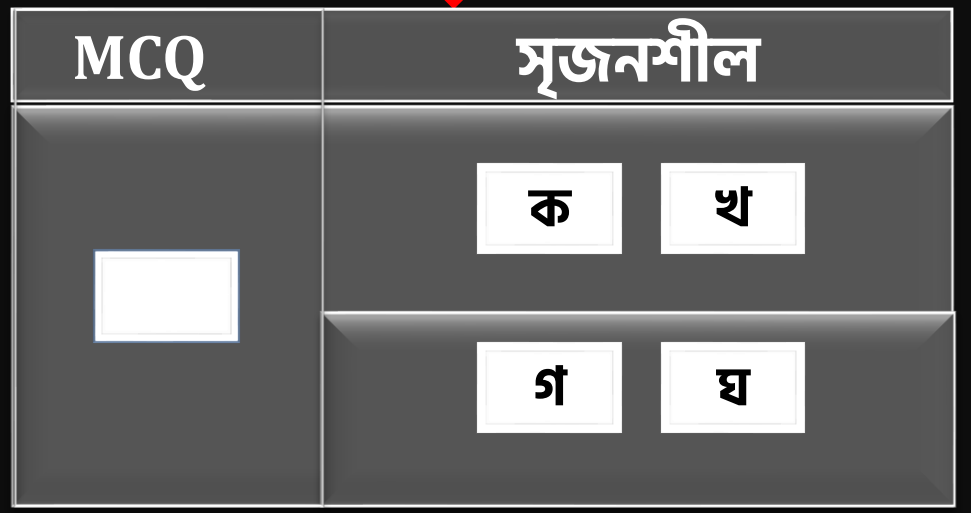

সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

লেনেস্কি (Lenski) সমাজ বিবর্তনের ধারাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- ১. আদিম সমাজ, ২. পশুপালন সমাজ, ৩. কৃষি সমাজ এবং ৪. শিল্প সমাজ। নিচে সমাজ বিবর্তনের বা বিকাশের এ ধারাগুলো আলোচনা করা হলো-

সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

আদিম সমাজ

আদিম সমাজ হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাজ। আদিম সমাজ হতে মানবসভ্যতার শুরু হয়েছে। এ সমাজকে নৃবিজ্ঞানিগণ অনক্ষর সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ যে সমাজে সভ্যতার আলো পৌঁছায়নি এবং যে সমাজের লোকেরা লিখতে ও পড়তে জানত না সে সমাজকে আদিম সমাজ বলা হয়। আদিম সমাজের লোকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল ও নিম্নমানের। তারা দলবদ্ধ হয়ে বনজঙ্গল হতে ফলমূল সংগ্রহ ও পশুপাখি শিকার করত এবং নদীনালা, খালবিল হতে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। এ সমাজের মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে পারত না, প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। তাই এ অর্থনীতিকে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি বলা হয়।

আদিম সমাজ তথা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা ছিল না, ছিল সামাজিক মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকার কারণে আদিম সমাজ ছিল শ্রেণিহীন। এ সমাজে খাদ্য ছিল অপ্রতুল। এ সময় কোনো বাড়তি খাবার জমা রাখার চিন্তাই করা যেত না। শিকারে যা পাওয়া যেত সবাই মিলে এক সঙ্গে ভূরিভোজন করত, নয়তো সবাই এক সঙ্গে উপোস করে থাকত। আদিম সমাজে প্রাকৃতিক শ্রমবিভাগ দেখা যায়। টাকাপয়সা, লেনদেন, হাটবাজার বলতে কিছুই ছিল না। তবে তাদের মধ্যে বিনিময় প্রথা বিদ্যমান ছিল।

সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

পশুপালন সমাজ

আদিম সমাজের মানুষেরা যাযাবর প্রকৃতির জীবনযাপন করত। তারা বনেজঙ্গলে ঘুরে স্থুলাকৃতির পাথরের হাতিয়ার দিয়ে পশুপাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। যখন থেকে খাদ্য উৎপাদন শুরু করল তখন থেকে তারা নিজেদের অনেকটা নিরাপদ ভাবতে লাগল। আবার যখন থেকে তারা বনের জীবজন্তুকে পোষ মানাতে শিখল তখন থেকেই পশুপালন সমাজের সূচনা হয়। অনুমান করা হয়, প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্বে শিকারি এবং খাদ্য সংগ্রহকারী গোষ্ঠী তাদের গৃহপালিত পশুকে পোষ মানাতে শিখে এবং কৃষিকাজে ব্যবহার করে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে। তবে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বা তারও পূর্বে মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বন্যপশুকে পোষ মানিয়ে পশুপালন শুরু করে।

তৃণভূমিতে পশুপালন সহজ মনে করে পশুপালন সমাজের মানুষেরা তৃণভূমির সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। এভাবে পশুপালন সমাজের মানুষেরা তৃণভূমিতে অবস্থান করে ক্রমান্বয়ে কৃষি পদ্ধতির সূচনা করে।

সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

পশুপালন সমাজ

এ সময়ে পাথরের নিড়ানিই তাদের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যত সময় পর্যন্ত এ পাথরের নিড়ানি কৃষিকাজে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ততদিন পর্যন্ত এ সময়কালকে নৃবিজ্ঞানিগণ 'হো-কালচার' (Hoe-Culture) বলে আখ্যায়িত করেন। ধ্যানধারণার অগ্রগতির সাথে সাথে তারা গৃহপালিত পশুকে কৃষিকাজে ব্যবহার করতে শিখে। পর্যায়ক্রমে এ সমাজ খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির পর্যায় থেকে খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির পর্যায়ে উন্নীত হয়।

Lowie তাঁর 'An Introduction to Cultural Anthropology' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, অর্থনৈতিক কারণেই শুধু পশুকে গৃহপালিত করা হয়নি, বরং এদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ এবং ধর্মীয় উৎসবে পশু বলি দেবার উদ্দেশ্যেও পশুকে গৃহপালিত করা হয়। তাছাড়া যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ঘোড়া ও গাধা ব্যবহার করা হতো এবং মালপত্র বহনেও এদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

পরিশেষে তাই বলা যায়, মানবসমাজ বিকাশের পথপরিক্রমায় পশুপালন সমাজের আবির্ভাব ঘটে। পশুপালন সমাজের বিকাশের ফলে মানুষ বন্য অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। এছাড়া খাদ্য উৎপাদনের কৌশল হিসেবে আদিম সমাজের মানুষ পশুপালনকে গ্রহণ করেছিল।

সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

কৃষিভিত্তিক সমাজ

কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের ক্ষেত্রে ইতিহাসে বিভিন্ন মতামতের ইঙ্গিত রয়েছে। অনেকের মতে, যাযাবর পশুপালকরা তৃণভূমিতে অবস্থান করে ক্রমান্বয়ে কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। কারণ পশুপালন ভূমি থেকে শাকসবজি এবং ফলমূল সংগ্রহ করা সহজতর ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, পশুপালন সমাজের পূর্বেই কৃষি সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল। অনেক. বিজ্ঞানী ধারণা করেছেন, প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে লাঙলের আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক সমাজের সূচনা হয়েছিল। অবশ্য মানবজীবনের সূচনালগ্নে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই মানুষ শুরুতে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। উল্লিখিত কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুমানভিত্তিক মতামতের আলোকে কোনো নির্দিষ্ট মতামতের সমর্থন না দিয়ে বলা যায়, পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধ্যানধারণার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়। আর এ সমাজেই খাদ্যের নিশ্চয়তা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

কৃষিভিত্তিক সমাজে ক্রমান্বয়ে ভূমির গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এ সংঘাতের ফলে পরাজিতদের প্রথমে মেরে ফেলা হতো। কিন্তু যখন উৎপাদনে শ্রমের চাহিদা দেখা দিল তখন থেকে তাদের বন্দি করে কৃষিকাজে নিয়োজিত করা হতো। এভাবে দাসপ্রথা ও ভূমিদাসের রূপলাভ করে।

সমাজ বিবর্তনে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

শিল্প সমাজ

কৃষি যুগের শেষ দিকে এবং শিল্প যুগে মানুষ শিল্পকারখানা গড়ে তোলে। এ সময় শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার এবং বিদ্যুতের ব্যবহারে শিল্পকারখানায় উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ছোট ছোট শিল্পকারখানার পাশাপাশি বৃহদায়তন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। সমাজে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের শ্রেণি এবং শ্রেণিবৈষম্য।

শিল্প যুগকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- ক. পুঁজিবাদী যুগ, খ. সমাজতান্ত্রিক যুগ ও গ. সাম্যবাদী যুগ। এ তিন যুগে সম্পত্তির প্রকৃতি ও মালিকানা ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির। পুঁজিবাদী যুগে দুটি শ্রেণি দেখা যায়। যথা- বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেণি। শিল্পকারখানা, ব্যাংক, বিমা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হলো বুর্জোয়া। এ ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা মজুরির বিনিময়ে উৎপাদন যন্ত্রে শ্রম বিক্রি করে।

পুঁজিবাদী যুগের পরবর্তী পর্যায়ে হলো সমাজতান্ত্রিক যুগ। এ যুগে কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পায় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানা থাকায় এখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ থাকে না। "সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ যার যার সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।" এটাই হলো সমাজতন্ত্রের মূলকথা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০৫ বিভিন্ন সমাজের তুলনা

টপিক ০৫: বিভিন্ন সমাজের তুলনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিভিন্ন সমাজের তুলনা

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধ্যয়নের সুবিধা অনুযায়ী সমাজকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের এ বিশ্লেষণকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মাধ্যমে চিন্তা করি। বাস্তবিকপক্ষে সমাজবিজ্ঞানীদের বিভক্ত সমাজকে অধ্যয়ন করার কারণ হলো সমাজের জটিল সম্পর্ক। সমাজবিজ্ঞানীগণ কোনো বিশেষ সমাজকে ভাগ করেননি। তারা সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে ব্যক্তির সাথে দলের সম্পর্ক ও দলের ওপর ব্যক্তির প্রভাবকেই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেই এ প্রকারভেদ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সমাজের তুলনা

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকে যেভাবে ভাগ করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলো–

১.	হার্বার্ট স্পেন্সার	:	১. Militant বা সংগ্রামশীল। ২. Industrial বা শিল্প সমাজ।
২.	স্যার হেনরি মেইন	:	১. Status বা অবস্থা। ২. Contact বা সান্নিধ্য।
৩.	ফার্ডিন্যান্ড টনিস	:	১. Gesel Ischaft (Community) বা সম্প্রদায়। ২. Gemenschaft (Society) বা সমাজ।
৪.	এমিল ডুর্খেইম	:	১. Mechanical Solidarity বা যান্ত্রিক সম্বন্ধযুক্ত। ২. Organic Solidarity বা আঙ্গিক সম্বন্ধযুক্ত।
৫.	হাওয়ার্ড বেকার	:	১. Sacred বা পূত। ২. Secular বা লৌকিক।
৬.	রবার্ট র‍্যাডফিল্ড	:	১. Folk Society বা গ্রাম্য সমাজ। ২. Urban Society বা শহুরে সমাজ।
৭.	কার্ল উইটফোগেল	:	১. Oriental Society বা প্রাচ্য সমাজ। ২. Occidental Society বা পাশ্চাত্য সমাজ।

বিভিন্ন সমাজের তুলনা

সমাজের উপরিউক্ত প্রকারভেদকে বিশেষভাবে লক্ষ করে বলা যায়, সকল সমাজবিজ্ঞানীই আধুনিক শিল্প সমাজের সাথে বিগত সবগুলো সমাজের তুলনা করেছেন। সকলেই সমাজকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য দেখিয়েছেন; যেমন- কোনো সমাজেই এ দুই প্রকার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নয়। সমাজকে পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বিভিন্ন সমাজের পরিবেশের সাথে বিভিন্নভাবে তার পার্থক্য রয়েছে।

সমাজকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ গোষ্ঠী সমাজ ও সংগঠন সমাজ- এ দুই ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন; যাকে আমরা 'ক্ষুদ্র সমাজ' ও 'বৃহৎ সমাজ' বলে থাকি। 'ক্ষুদ্র সমাজ' বা 'গোষ্ঠী সমাজ' হচ্ছে পরিবেশ ও গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। ক্ষুদ্র সমাজ বিশেষ সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত। আর বৃহৎ সমাজ হচ্ছে সাংগঠনিক। বৃহৎ সমাজ যেকোনো সীমারেখার আওতামুক্ত।

আমরা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ করি। সমাজবিজ্ঞানী টনিস যেমন- শিল্প সমাজের সাথে প্রাক-শিল্প সমাজের তুলনা করেছেন, ঠিক তেমনি তুলনামূলকভাবে হার্বার্ট স্পেন্সার ও ডুর্খেইম সমাজকে চার ভাগে বিভক্ত ও বিশ্লেষণ করে স্থান, কাল ও পরিবেশের তুলনা করেছেন। ও সারকথার কোনো তি

বিভিন্ন সমাজের তুলনা

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) তার 'The Principles of Sociology' গ্রন্থে বসতির ভিত্তিতে সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- যাযাবর সমাজ, স্থায়ী বসতি সমাজ এবং আধা স্থায়ী সমাজ। হার্বার্ট স্পেন্সার সমাজকে সাধারণভাবে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. মৌলিক সমাজ, ২. মিশ্রিত সমাজ, ৩. দ্বি-মিশ্রিত সমাজ এবং ৪. ত্রি-মিশ্রিত সমাজ।

বিভিন্ন সমাজের তুলনা

ডুর্খেইম ও স্পেন্সারের মতে, সমাজের শ্রেণিবিভাগ হচ্ছে-

১. মৌলিক সমাজ,

২. মৌলিক বহুখণ্ডিত সমাজ,

৩. মৌলিক বহুখণ্ডিত মিশ্রণ সমাজ এবং

৪. মৌলিক দ্বিখণ্ডিত মিশ্রণ সমাজ।

এছাড়া বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকে পৃথকভাবে ভাগ করেছেন। কার্ল মার্কস তাঁর 'Contribution to the Critique of Political Economy' গ্রন্থে পাঁচটি সামাজিক স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে সমগ্র সমাজকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো-

১. আদিম সমাজ,

২. প্রাচীন সমাজ,

৩. এশিয়াটিক সমাজ,

৪. সামন্তবাদ সমাজ ও

৫. পুঁজিবাদ সমাজ।

বিভিন্ন সমাজের তুলনা

হবহাউস, হিলার এবং জিন্সবার্গ 'Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples' গ্রন্থে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে চার শতেরও বেশি ভাগে সমাজকে ভাগ করেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের প্রকারভেদ করলে তখনই তা যুক্তিসংগত হবে যখন তার সাথে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, পরিবার ও রাজনৈতিক কাঠামোর সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।

পরিবেশের জটিলতার সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন রূপ দেখা দেয় বলে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা। ফলে সমাজের যে কাঠামো অধিকভাবে বিকাশ লাভ করে সে পরিবেশের ভিত্তিতে সমাজকে বিচার করা সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানীগণ সেদিক থেকে ধারণা করেই সমাজের প্রকারভেদ করেছেন। ডুর্খেইম বলেছেন, ব্যক্তিসত্তার সমষ্টি থেকেই সমাজ সৃষ্টি হয়। আবার স্যার হেনরী মেইন ও কার্ল উইটফোগেল সমাজের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে ভাগ করেছেন। হেনরি মেইন সমাজে 'Status' ও 'Contact' এ দুই ভাগে ভাগ করেছেন এবং কার্ল উইটফোগেল 'Oriental and Occidental' এ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কাজেই সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা সমাজের বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ করি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০৬ সংস্কৃতির ধারণা

টপিক ০৬: সংস্কৃতির ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সংস্কৃতির ধারণা

'সংস্কৃতি' প্রত্যয়টির পরিধি ব্যাপক। সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Culture, বাংলায় একে কৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। 'কৃষ্টি' শব্দের অর্থ হলো কর্ষণ বা চাষ। ইংরেজি সাহিত্যে সর্বপ্রথম ফ্রান্সিস বেকন উনিশ শতকে Culture শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি ক্ষুদ্রতর ও বৃহৎ দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্রতর অর্থে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজনিত উৎকর্ষ। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা যা কিছু চিন্তা করি এবং যা কিছু সম্পন্ন করি তার সমষ্টি হলো সংস্কৃতি। নৃবিজ্ঞানিগণ সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তাদের মতে, আমাদের জীবনের সব দিকগুলোই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, মানুষের মার্জিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃতির ধারণা

ই. বি. টেইলর তার 'Primitive Culture' গ্রন্থে বলেন, "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." (সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচার-আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিপ্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হলো সংস্কৃতি)।

ম্যাকাইভার (MacIver) -এর মতে, 'Our culture is what we are'. (মানুষ হিসেবে আমরা যা করি তাই আমাদের সংস্কৃতি।)

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট তার 'Fundamentals of Sociology'-তে বলেন, "This complex whole of objects and ways of behaviour of material and immaterial interests and satisfactions has been designated by early modern anthropologists by the name of culture." (এ সকল বস্তু এবং আচরণের ধারা, পার্থিব ও অপার্থিব স্বার্থ এবং সন্তোষ এসব কিছুর জটিল সমগ্রতাকেই প্রাচীন ও আধুনিক নৃতত্ত্ববিদগণ সংস্কৃতি নামে অভিহিত করেছেন)।

সমাজবিজ্ঞানী Jones-এর মতে, "Culture is the sum total of man's creation." (মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি।)

সংস্কৃতির ধারণা

মার্কসের মতে, সংস্কৃতি হলো উপরিকাঠামো, অর্থনৈতিক কাঠামো হলো সমাজের মূলভিত্তি এবং এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সমাজের উপরিকাঠামো, সংস্কৃতি সমাজের উপরিকাঠামোর অন্তর্গত বিষয়।

নৃবিজ্ঞানী ডিউই তার 'Democracy and Education' গ্রন্থে বলেন, "Culture means at least something cultivated, something ripened, it is opposed to the raw and crude." (সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটা কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণ লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের বিরোধী)।

নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনস্কি তার 'A Scientific Theory of Culture' গ্রন্থে বলেন, "As the handiwork of man and is the medium through which he achieves his end." (মানুষের তৈরি বস্তুও একটি উপায় যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে)।

সংস্কৃতির ধারণা

ম্যাকেঞ্জি তার 'Outline of Social Philosophy' গ্রন্থে বলেন, "In the narrower sense it is to be regarded mainly as a process of imitation into the life of the community, in the wider sense it is rather the development of the spiritual nature of man, of which the life of the community as an instrument." (সংকীর্ণ অর্থে এ হলো সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা, ব্যাপকতর অর্থে এ হলো মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজজীবন হলো একটি উপায় মাত্র)। সমাজবিজ্ঞানী পি. এ. সরোকিন তার 'Social and Cultural Dynamics' গ্রন্থে বলেন, "দুটি ব্যক্তির চেতন ও অচেতন ব্যবহারের যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া তার ফলে সৃষ্ট ও পরিবর্তিত যা কিছু তার সমগ্রতাই সংস্কৃতি।"

সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স এর মতে, সংস্কৃতি একাধারে ব্যক্তি ক্রিয়ার ফল ও ব্যক্তি ক্রিয়ার নির্ধারক।

সংস্কৃতির ধারণা

Robert Bierstedt তার 'Social Order' গ্রন্থে বলেছেন, "Culture is the complex whole that consist of everything, we think and do as a member of Society." (সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা যা কিছু চিন্তা করি এবং যা কিছু সম্পন্ন করি তার সমষ্টি হচ্ছে সংস্কৃতি।)

অতএব বলা যায়, মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে যা কিছু সৃষ্টি করছে সেসবের সম্মিলিত রূপই সংস্কৃতি। মানব সংস্কৃতি সামাজিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বা এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবাহিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০৭ সভ্যতার ধারণা

টপিক ০৭: সভ্যতার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সভ্যতার ধারণা

সাধারণ অর্থে, সভ্যতা বলতে বোঝায় মানুষের সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট সময়ের গড় ফল। অর্থাৎ মানবসমাজের দীর্ঘপ্রয়াসে প্রাপ্ত সাফল্যের স্তরই হলো সভ্যতা। সমসাময়িক অন্যান্য সমাজের সংস্কৃতির চাইতে অগ্রসর বস্তুগত সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজই সভ্য বা তাদের সংস্কৃতির সভ্যতা।
সভ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Civilization. শব্দটি Latin শব্দ Civilis থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো নাগরিক। সুতরাং Civilization শব্দটির অর্থ হলো সুসভ্য নাগরিক সমাজ, যেখানে নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। দার্শনিক ভলতেয়ার সর্বপ্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেন।

সভ্যতার ধারণা

মন্টেস্কু ও হান্টিংটন বলেন, "সভ্যতা হলো ভৌগোলিক তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি আশীর্বাদপুষ্ট ফসল।"

মর্গান তার 'Ancient Society' গ্রন্থে বলেন, "সভ্যতা হলো বিবর্তন নামক সিঁড়িটির এক শীর্ষ ধাপ। তার সভ্যতা বিকাশের সিঁড়ির ধাপসমূহ হলো- বন্য দশা, বর্বর দশা ও সভ্য দশা। এখানে বন্য দশা বলতে মানবজাতির শৈশব থেকে আরম্ভ করে মৃৎশিল্প আবিষ্কারের পূর্বপর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়। বর্বর দশা বলতে প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের খাদ্য তৈরির কৌশল আয়ত্ত করাকে বোঝায়। সবশেষে সভ্য দশা বলতে সেই সমাজকে বোঝায় যে সমাজে লেখ্য ভাষা ও বর্ণমালা আছে, ধাতুর তৈরি দ্রব্য ব্যবহার ও লিখিত দলিলের ব্যবহার আছে।

MacIver তার 'The Modern State' গ্রন্থে বলেন, "Our culture is what we are, our civilization is what we use." (আমাদের সংস্কৃতি হলো আমরা যা তাই এবং আমরা যা ব্যবহার করি তাই হলো আমাদের সভ্যতা)।

অগবার্ন ও নিমকফের মতে, অধিজৈবিক সংস্কৃতির পরবর্তী স্তরই সভ্যতা।

সভ্যতার ধারণা

Arnold Toynbee বলেন, "Our civilization is the institutionalization of a system of ethical and religious tradition and ideologies that dominate a society or a number of related societies." (সভ্যতা বলতে নীতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং আদর্শের এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে বোঝায় যা এক বা একাধিক সমাজকে প্রভাবিত করে)। সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে টি. ডব্লিউ ওয়ালব্যাংক এবং এ. এম. টেইলর তাদের 'Civilization-past and Present' গ্রন্থে বলেন, Civilization may be defined as a type of Advanced human life based usually an city living and on involved pattern of activities mode up of such forces as writing law, government economics and refined concepts of religion." (অগ্রসরমান মানবজীবনের নগর জীবন এবং নগর জীবনের সকল দিক এমনকি মানবীয় কর্মকাণ্ডের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়সহ সকল দিকই সভ্যতার অন্তর্গত।)

সভ্যতার ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাথিউ অ্যারনল্ডের 'Culture and Anarchy' গ্রন্থে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার ভাষায়, "The study of perfection, the disinterested search for sweetness and light" and he argues that it consists, in becoming something, rather then in having something in an inward condition of mind and sprit, not in an outward set of circumstances, white civilization on is relatively mechanical and external and tends constantly to become more so." (সংস্কৃতি নিখুঁত নিখাদের সমীক্ষা, আলো ও মধুরতার নিরাসক্ত অন্বেষা। তিনি যুক্তি দেখান কোনোকিছু পাওয়ার চেয়ে কোনোকিছু হওয়া এটা হচ্ছে মনের অবস্থা ও শক্তি বাহ্যিক কোনো অবস্থা নয়। অন্যদিকে, সভ্যতা আপেক্ষিকভাবে যান্ত্রিক, বাহ্যিক ও অবিরতভাবে তা এরূপ হতেই থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী টি. বি. বটোমোর বলেন, "সভ্যতা বলতে আমরা এমন একটি সাংস্কৃতিক জটিল রূপকে বুঝি, যা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সমাজের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা গঠিত।"

সভ্যতার ধারণা

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী জিন্সবার্ট তার 'Fundamentals of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Thus civilization is external and mechanical, utilitarian and concerned only with means, while culture as dealing exclusively with ends, is internal organic and final." (সভ্যতা হলো বাহ্যিক ও যান্ত্রিক, জনকল্যাণ কর এবং উপায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু সংস্কৃতির কাজ লক্ষ্য নিয়ে, তাই সংস্কৃতি হচ্ছে অত্যন্তরীণ, অর্জিত এবং সম্পূর্ণ দিক।)

সভ্যতার ধারণা

William P. Scott তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Civilization generally refers to a highly complex, as contrasted with a relatively culture," সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, "সভ্যতা হচ্ছে এক উচ্চতর জটিল সংস্কৃতি।"
W. P. Scott আরও বলেন, 'সভ্যতা অগ্রসরমান এবং জটিল সমাজকে নির্দেশ করে।'
প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডন মার্টিন ডেল-এর মতে, "উন্নত ধরনের শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম এরই সম্মিলিত অর্থে সভ্যতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।"
ম্যাকাইভার এবং পেজ (MacIver & Page)-এর মতে, সভ্যতা অর্থে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবনধারণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা, কলাকৌশল ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে তারই সামগ্রিক রূপ।
অতএব বলা যায়, সভ্যতা হলো সংস্কৃতির অধিকতর জটিল এবং অগ্রগতির ফল যা বংশপরম্পরায় লাভ করা যায়। বস্তুত এটি হলো নগর প্রপঞ্চ। নগরের বিকাশের সাথে সাথে সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং নগরের ধ্বংসের সাথে সাথে সভ্যতাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০৮ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

টপিক ০৮: সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

মানুষের ভাবধারা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, আইন, ভাষা এবং মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি, এমনকি বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব কৌশল অবলম্বন করে সেসবের সমষ্টি হলো মানুষের সংস্কৃতি। আর মানুষ যখন তার কলাকৌশল কিংবা নিজস্ব প্রচেষ্টার দ্বারা এবং প্রয়োজনে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে একটি সামগ্রিক সমাজজীবন গড়ে তোলে তখন তার বাহ্যিক বস্তুগত প্রতিফলনকে সভ্যতা বলা হয়। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তেমনি এদের মধ্যে কতিপয় সুস্পষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে উভয়ের পার্থক্য জানতে হবে।

সংস্কৃতি হলো মানুষের অবস্তুগত সৃষ্টি। যেমন- দক্ষতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ইত্যাদি। সভ্যতা হলো মানুষের বস্তুগত সৃষ্টি। যেমন- ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে, "Our culture is what we are, civilization is what we use or have." ('আমরা যা' তাই আমাদের সংস্কৃতি এবং আমরা 'যা ব্যবহার করি' সেটাই সভ্যতা)।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

সমাজবিজ্ঞানী J. L. Gillin and T. P. Gillin-এর মতে, "সংস্কৃতি বলতে একদিকে যেমন বস্তুগত আবিষ্কারকে বোঝায়, তেমনি অন্যদিকে ওই বস্তুগত আবিষ্কারের পিছনে ক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা সংক্রান্ত জ্ঞানকে বোঝায়।" বক্তব্যটি থেকে সংস্কৃতিকে স্পষ্টতই দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ক. বস্তুগত সংস্কৃতি ও খ. অবস্তুগত সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে, সভ্যতার কোনো শ্রেণিবিভাগ করা যায় না।

সংস্কৃতির উন্নতি বা মানকে সর্বক্ষেত্রে পরিমাপ করা যায় না। সভ্যতার অগ্রগতিকে সহজেই পরিমাপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ দুই ধরনের সংগীতের মধ্যে কোনটি অধিকতর উন্নতমানের তা নির্ণয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো মাপকাঠি নেই।

যেমন- কারও কাছে পল্লিগীতি আবার কারও কাছে নজরুলগীতি ভালো লাগে।

এক দেশের সংস্কৃতি অন্যকোনো দেশ বা জাতি দ্বারা সহজে গৃহীত হয় না। তবে যে একেবারে হয় না তা নয়। বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশ বা জাতি দ্বারা গৃহীত হতে পারে।ন কোচকান ভাড়া

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

একটা বিশেষ ধারায় সংস্কৃতি এগিয়ে চলে। তবে সংস্কৃতির এ গতি তুলনামূলকভাবে মন্থর। সভ্যতা সাধারণত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার গতির তারতম্যের কারণে সমাজে এক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সমস্যাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক ব্যবধান বা Cultural differences.

সংস্কৃতির গতি মন্থর বা দ্রুত যাই হোক না কেন, সংস্কৃতির একটা সংলগ্নতা বা ক্রমধারাবাহিকতা রয়েছে। সংস্কৃতি কখনই পরাজিত হয় না। সভ্যতার গতি যাই হোক না কেন তা পরাজিত হয় এবং তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন সভ্যতা; যেমন- সিন্ধু সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতার দিকে তাকালেই আমরা বিষয়টির সত্যতা অবলোকন করতে পারব। এসব সভ্যতায় দেখা যায়, কোনো প্রাকৃতিক কারণে, পৈশাচিক কারণে বা অন্য কোনো কারণে ওইখানে বসবাসরতদের সভ্যতা অবলীলাক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। তবে তার নিদর্শন আজও বিদ্যমান রয়েছে।

দার্শনিক কান্ট (Kant) বলেন, “সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের ভিতরকার রূপ, তাকে লুকিয়ে রাখা যায়; অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো Inward state of man." সভ্যতা সম্পর্কে দার্শনিক কান্ট (Kant) বলেন, "সভ্যতা হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ।” সভ্যতার প্রতিফলন সুস্পষ্ট, একে লুকিয়ে রাখা যায় না; যেমন- কোনো দেশের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে সহজেই সেদেশের সভ্যতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কিন্তু সেদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হলে সেই দেশের মানুষের সাথে নিবিড় সংস্পর্শে আসতে হবে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver)-এর মতে, "সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের দিকনির্দেশক যন্ত্র। পক্ষান্তরে, সভ্যতা হলো সমাজ পরিচালনার শক্তি।" বিষয়টি স্পষ্ট করতে তিনি একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। সেখানে তিনি সভ্যতাকে এমন এক জাহাজের সাথে তুলনা করেছেন, যা যেকোনো বন্দরে নোঙর করতে পারে। কিন্তু আমরা কোথায় যাব, কোন দেশে যাব, কোন দেশের খাদ্য আমাদের আকর্ষণীয় সেটা আমাদের সংস্কৃতিই নির্ধারণ করে দিবে।

ম্যাথিউ আরনল্ড (Mathew Arnold)-এর মতে, "সংস্কৃতি হচ্ছে খাঁটি হওয়া, রুচিশীল হওয়া। এটি একটি মানসিক অবস্থা। সভ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সভ্যতার অর্থ কোনোকিছু থাকা, কোনোকিছু অর্জন করা। এটি একটি বাহ্যিক পরিবেশ।" সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ (M. F. Nimcoff)-এর মতে, সংস্কৃতির চাহিদা এবং আবেদন তুলনামূলক কম। সভ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিমকফ বলেন, সভ্যতার চাহিদা এবং তার আবেদন সংস্কৃতির তুলনায় অনেক বেশি।

যদিও সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং একে অপরের সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সভ্যতা। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, উর্বর মাটি ও উপযুক্ত জলবায়ু ব্যতিরেকে চারা গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ ও উন্নতির প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সভ্যতার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির এ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

সভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তার ও বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সভ্যতার অবদানকে অগ্রাহ্য করে সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসার কল্পনা করা যায় না। উন্নত সভ্যতার সাথে সংস্কৃতির অগ্রগতির ইতিবাচক সম্পর্ক বর্তমান। অর্থাৎ সভ্যতা যত বেশি সমৃদ্ধি লাভ করে সংস্কৃতির অগ্রগতির সম্ভাবনা তত বেশি বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সভ্যতার অবদান হিসেবে চিত্রশিল্পীর রং তুলি, সমাজে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক সামগ্রী, সংগীত-নাটকের বহুবিধ আধুনিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উন্নত সভ্যতার ভিত্তিতে উন্নত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মত হলো, একটি জলযান কারিগরি দিক থেকে যত বেশি নিখুঁত হবে, তার গতিবেগ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। ফলে জলযানটির আওতার মধ্যে আসবে আরও অধিকসংখ্যক বিকল্প বন্দর। এ রূপকের জলযানটি হলো সভ্যতার উপাদান এবং সাংস্কৃতিক পছন্দের প্রতীক হলো বিকল্প বন্দর।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। সভ্যতা হলো মানবসমাজের চালিকাশক্তি এবং সংস্কৃতি হলো এ শক্তির নিয়ামক। মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। আসলে মূল্যবোধের দ্বারাই সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। অনুরূপভাবে সভ্যতাও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে সংস্কৃতি সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সভ্যতার উপাদানসমূহের প্রয়োগ পদ্ধতি সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সংস্কৃতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। আবার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয় সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার ও প্রয়োগ।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য থাকে। দীর্ঘকাল পরে এক সময় সভ্যতার উপাদানসমূহ সাংস্কৃতিক তাৎপর্যযুক্ত প্রতিপন্ন হয়। যেমন- প্রাচীন মুদ্রা, স্থাপত্য, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আদিম মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রাচীন সভ্যতার দ্রব্যসামগ্রী যেমন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়, তেমনি সাংস্কৃতিক পরিচয়ও প্রদান করে। অনুরূপভাবে কোনো একটি দেশের সংবিধান একাধারে প্রশাসনের মাধ্যম বা উপায় হিসেবে কাজ করে এবং সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর সত্তা বা প্রকৃতির পরিচায়ক হিসেবেও প্রতিপন্ন হয়। সেদিক থেকে সভ্যতা সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি ও সভ্যতা একই উৎস হতে উদ্ভূত। একারণে একে অন্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। সঠিক বিচারে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিভা হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতি উভয়েরই উৎস। মানবসংস্কৃতির উৎস নিহিত থাকে মানুষের প্রকৃতি বা প্রবণতার মধ্যে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পারিক সম্পর্ক

আর সভ্যতা সৃষ্টি হয় সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে। আবার এ সমাজ সৃষ্টি করেছে মানুষ। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে সমাজস্থ মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে সভ্যতার অবদান ও সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের যেমন লজ্জা নিবারণ করে, তেমনি আবার রুচিবোধেরও পরিতৃপ্তি সাধন করে। মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রয়োগ করে তার রুচিবোধ ও মূল্যবোধ অনুসারে। সভ্যতার বিভিন্ন অবদান সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক কালজয়ী রূপলাভ করে। যেমন- মমতাজের স্মৃতিসৌধ 'তাজমহলের' কথা। এ তাজমহল মমতাজের স্মৃতিসৌধ ছাড়াও সমকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয়ের এক অভিনব অভিব্যক্তি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ০৯ সংস্কৃতির ধরণ

টপিক ০৯: সংস্কৃতির ধরণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ গ ঘ

সংস্কৃতির ধরণ

সংস্কৃতি হলো পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ধরন ও জীবনধারণ কৌশলসমূহের সমষ্টি। মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি বিকশিত হয়। সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান এ সংস্কৃতিকে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম এফ. অগবার্ন তার 'Social Change' গ্রন্থে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

বস্তুগত সংস্কৃতি: বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে বাস্তব বস্তু বা দ্রব্যনির্ভর সংস্কৃতিকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সংস্কৃতি মানুষের নির্মিত বস্তু বা দ্রব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে বস্তুগত বা পার্থিব বা Material সংস্কৃতি বলে। বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র, বই ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখা দরকার, বস্তুগত সংস্কৃতি বস্তুনির্ভর; তাই তা মনমানসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বস্তুগত সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়টিও জড়িত থাকে। কারণ মানুষ প্রয়োজন পূরণের জন্য যেসব বস্তু, বিষয় ইত্যাদি উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করেছে, সেটিই বস্তুগত সংস্কৃতি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

সংস্কৃতির ধরণ

অবস্তুগত সংস্কৃতি: মানুষ জীবনধারণের বিভিন্ন অবস্থায় তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেসব অবস্তুগত সামগ্রী বা উপাদান সৃষ্টি করেছে তার সমষ্টি হলো অবস্তুগত বা অপার্থিব সংস্কৃতি। অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের মেধা, ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, চলনবলন, কথন, রীতিনীতি তথা মূল্যবোধ, আবেগ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে বোঝায়। উৎপাদন কৌশল যেমন বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক, তেমনি মানবসৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবস্তুগত সংস্কৃতির একেকটি বিশেষ দিক।

সংস্কৃতির ধরণ

বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য : বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো-

• বস্তুগত সংস্কৃতি হলো মানুষের বস্তুগত সৃষ্টি। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি হলো মানুষের অবস্তুগত সৃষ্টি ।

• বস্তুগত সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্য আচরণের সম্পর্ক রয়েছে এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি ব্যক্তিমনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ।

• বস্তুগত সংস্কৃতির গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে চলে ।

• দক্ষতার ভিত্তিতে বস্তুগত সংস্কৃতির পরিমাপ করা যায়। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতির বিচার হয় মানসিক উৎকৃষ্টের ভিত্তিতে।

• বস্তুগত সংস্কৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায় । অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়।

• বস্তুগত সংস্কৃতির অবদানকে অতি সহজেই উপলব্ধি বা গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতির অবদানকে সাধারণ মানুষ অতি সহজে উপলব্ধি বা গ্রহণ করতে পারে না।

• বস্তুগত সংস্কৃতি সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সার্বিক বিবেচনায় বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক

সংস্কৃতির ধরণ

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক: সংস্কৃতি ও সভ্যতা একটি আরেকটির পরিপূরক। এদের মধ্যে সাদৃশ্যের পাশাপাশি কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্য: সংস্কৃতি ও সভ্যতা মূলত মানুষের সৃষ্টি। একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সংস্কৃতির যেমন উন্নতি হয়েছে, ঠিক তেমনই সভ্যতার অবদানের ফলেই সংস্কৃতি নিজেকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছে। সভ্যতা হলো সংস্কৃতির অংশ। তাই বলা যায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, 'সভ্যতা যদি হয় দেহ, তবে আত্মা হলো সংস্কৃতি। এজন্য সংস্কৃতিকে সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি বলা হয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য: দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতাকে পরিমাপ করা যায়। অন্যদিকে সংস্কৃতির বিচার হয় মানসিক উৎকর্ষের ভিত্তিতে। সংস্কৃতি ও সভ্যতা আন্তঃনির্ভরশীল ও আন্তঃক্রিয়াশীল। সংস্কৃতি হলো মানবপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি অন্যদিকে সভ্যতা হলো মানবসৃষ্ট যাবতীয় যন্ত্রপাতি।

সংস্কৃতির ধরণ

'ম্যাকাইভারের মতে, সভ্যতা হলো সমাজ পরিচালনার শক্তি, পক্ষান্তরে সংস্কৃতি হলো তার নির্ধারক যন্ত্র।
'দার্শনিক ক্যান্ট'-এর মতে, সংস্কৃতি হলো ব্যক্তি মনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার পক্ষান্তরে সভ্যতা হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ। এজন্যই তা যান্ত্রিক এবং উপযোগিতা পূরণের কলাকৌশল।
পি. জিসবার্টের (Gisbert) মতে, সংস্কৃতি হলো অন্তঃস্থ, আর্থিক ও চূড়ান্ত অপরপক্ষে সভ্যতা হলো বাহ্যিক, যান্ত্রিক এবং উপযোগিতামূলক।
অতএব বলা যায়, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতিকে সভ্যতা থেকে আলাদা করা যায় না। অর্থাৎ সভ্যতা হলো বস্তুগত সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১০ সামাজিক দল বা গোষ্ঠী

টপিক ১০: সামাজিক দল বা গোষ্ঠী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক দল বা গোষ্ঠী

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক প্রত্যয় হলো গোষ্ঠী বা দল। সাধারণভাবে গোষ্ঠী বা দল বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝায় যাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান, আবেগ ও সংবেদনশীলতা রয়েছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ম্যাকাইভার ও পেজ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "গোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝি একটি মানুষের সমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।"

সমাজবিজ্ঞানী শেরিফ-এর মতে, "গোষ্ঠী হলো একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা ও ভূমিকাসম্পন্ন এমন কিছু লোকের সমষ্টি যাদের আচরণ ও বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করার মতো সাধারণ মূল্যবোধ ও রীতিনীতি রয়েছে।"

অধ্যাপক জিসবার্ট তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Fundamentals of Sociology'-তে বলেন, "সামাজিক গোষ্ঠী হলো সেই ধরনের-ব্যক্তির সমষ্টি যারা স্বীকৃত একটি কাঠামোর মধ্যে একে অপরের ওপর ক্রিয়াশীল থাকে।"

সমাজবিজ্ঞানী সিলভার গাইনার তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "A Social group may be defined as a member of individuals who find themselves in a state of mutual and relatively lasting integration." (সামাজিক দল বলতে কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে বোঝায় যা একে অন্যের সাথে পারস্পরিক স্থায়ী সংহতিতে আবদ্ধ)।

সামাজিক দল বা গোষ্ঠী

সমাজবিজ্ঞানী টি.বি. বটোমোর (T.B Bottomore) -এর মতে, সামাজিক দল হলো এমন কিছু ব্যক্তির সমষ্টি, যাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং যারা প্রত্যেকে দল ও তার প্রতীক রূপ সম্পর্কে সচেতন।

Oxford Concise Dictionary of Sociology অনুযায়ী, "সামাজিক দল হচ্ছে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ যাদের একই গোষ্ঠীতে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সদস্যপদ রয়েছে এবং যারা একাত্মতাবোধ করে বা যাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার স্থিতিশীল ছক বিরাজ করে।" (A number of individuals, defined by normal or informal criteria of membership, who share a feeling of unity or are bound together in relatively stable patterns of interaction.)

নৃবিজ্ঞানী রবার্ট কে. মার্টনের মতে, "দল হচ্ছে এমন কিছু লোকের সমষ্টি যারা একে অপরের সাথে স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট ধারায় বা প্রণালিতে মিথস্ক্রিয়ারত হয়। যারা মনে করে, তারা একটি নির্দিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যদের মনে করে যে, তারা ওই দলের সদস্য নয়।

অধ্যাপক পি. জিসবার্টের মতে, "সামাজিক দল হচ্ছে সমাজের কাঠামো সংবলিত ব্যক্তিবর্গ যারা একে অন্যের সাথে নিবিড় সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ।"

সামাজিক দল বা গোষ্ঠী

সমাজবিজ্ঞানী Small তার 'General Sociology' গ্রন্থে বলেন, "গোষ্ঠী হচ্ছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এমন একটি দল যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এমন একটি সম্পর্ক যা দলের সদস্যদেরকে একইসূত্রে গ্রথিত করে।"

অতএব বলা যায়, সামাজিক দল হচ্ছে পারস্পরিক চেতনাসমৃদ্ধ এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি। এ দলবদ্ধ সকল সদস্য একই বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য থাকে, যার মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১১ গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ১১: গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক গোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। নিচে গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হলো- প্রথমত, সমাজবিজ্ঞানী সামনার তার 'Folkways' নামক গ্রন্থে মানবসমাজে গোষ্ঠীর দুটি শ্রেণিবিভাজন করেন। যথা-

১. অন্তর্গোষ্ঠী (Internal group): অন্তর্গোষ্ঠী হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যাতে কোনো ব্যক্তি নিজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ ধরনের গোষ্ঠীকে আবার 'আমাদের গোষ্ঠী'ও বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রহিম জেলে সম্প্রদায়ের লোক। এখানে রহিম প্রত্যক্ষভাবে জেলে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং জেলে সম্প্রদায় রহিমের নিকট অন্তর্গোষ্ঠী।

২. বহির্গোষ্ঠী (External group): যে গোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কযুক্ত নয় বা তার সদস্য নয় সেটাই ওই ব্যক্তির কাছে বহির্গোষ্ঠী বলে বিবেচিত। এ গোষ্ঠীকে 'অন্য গোষ্ঠী' বলা হয়। গোষ্ঠীর এ বিভাজনটি একজন বিশেষ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। কেননা একজন ব্যক্তির কাছে যেটি অন্তর্গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তির কাছে সেটি বহির্গোষ্ঠী বলে মনে হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রহিম জেলে সম্প্রদায়ের লোক। এখানে রহিমের নিকট অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি সম্প্রদায় বহির্গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হবে।

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

দ্বিতীয়ত, সমাজবিজ্ঞানী কুলি তার 'Social Organization' নামক গ্রন্থে গোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করেন-

১ . প্রাথমিক বা মুখোমুখি গোষ্ঠী (Primary or frontal group): যে দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ, নিবিড় ও মুখোমুখি সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে মুখ্য দল বা প্রাথমিক দল বলে। ১৯০৯ সালে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী চার্লস কুলি মুখ্য দল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। এখানে সদস্যরা মুখোমুখি অবস্থান করে। প্রাথমিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের মধ্যে 'আমরা ভাব' বিদ্যমান থাকে। যেমন- পরিবার, খেলার সাথী, পাড়া ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যরা সবাই নিজেদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' পোষণ করে।

২. মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary group) : প্রাথমিক গোষ্ঠীর গণ্ডি বেশ সীমিত। এর সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতাবোধও বেশ প্রবল এবং অকৃত্রিম। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যরা একই পরিবার ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সদস্য। পক্ষান্তরে, মাধ্যমিক গোষ্ঠীর গণ্ডি বেশ বৃহৎ এবং এর উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত। এখানে সদস্যরা তুলনামূলকভাবে কম নিবিড় এবং সম্পর্কটা অনেকটা আনুষ্ঠানিক নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরা কিছু নীতি ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত থাকে। যেমন- রাজনৈতিক দল, সম্প্রদায়, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি।

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

তৃতীয়ত, ম্যাকডোনাল্ড গোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-
১. সময়োচিত গোষ্ঠী (Accidental group) ও
২. উদ্দেশ্যমূলক গোষ্ঠী (Purposive group) |
চতুর্থত, সি. এ. এলউড তার 'Psychology of Human Society' গ্রন্থে গোষ্ঠীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। যেমন-
১. অনৈচ্ছিক ও ঐচ্ছিক গোষ্ঠী পরিবার, নগর এবং রাষ্ট্র অনৈচ্ছিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। কেননা এখানে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নয় বরং জন্মগতভাবে সদস্যপদ লাভ করে। অপরপক্ষে রাজনৈতিক দল, সংঘ বা সাংস্কৃতিক সংঘ ঐচ্ছিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। কেননা এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সচেতন মনে সদস্য হিসেবে যোগদান করে।
২. প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী স্থায়ী গোষ্ঠী; যেমন- চার্চ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। অস্থায়ী গোষ্ঠী; যেমন- জনতা, ক্রীড়া সংঘ (যা প্রায় গড়ে ও ভাঙে) ইত্যাদি অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

পঞ্চমত, পার্ক ও বার্জেস গোষ্ঠীকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। যথা-

১. স্থানভিত্তিক গোষ্ঠী: যেসব গোষ্ঠী কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় গড়ে ওঠে তাকে স্থানভিত্তিক গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন- সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

২. অস্থানভিত্তিক গোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নয় এমন গোষ্ঠীকে অস্থানভিত্তিক গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন-সামাজিক শ্রেণি, জাতি-বর্ণ ইত্যাদি।

পার্ক ও বার্জেস উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও গোষ্ঠীর একটি ব্যাপক শ্রেণিবিভাগের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো-ক. পরিবার, খ. ভাষা বা নরবংশগত গোষ্ঠী, গ. স্থানভিত্তিক গোষ্ঠী, ঘ. দ্বন্দ্বমূলক গোষ্ঠী (রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি) ও ৬. সামাজিকভাবে খাপ খাইয়ে চলা সংগঠিত গোষ্ঠী (সামাজিক শ্রেণি এবং জাতি-বর্ণ)।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১২ সংঘ

টপিক ১২: সংঘ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সংঘ

সমাজজীবনে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। সংঘ বা সমিতি সামাজিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশের আরেকটি সুশৃঙ্খল রূপ। সংঘ গড়ে ওঠে মূলত কতিপয় মানুষের ইচ্ছার মাধ্যমে। সমাজ সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আচার-আচরণ ও রূপগত চাহিদাতেও পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হয়ে এ লক্ষ্যার্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে তখন তাকে সংঘ বা সমিতি বলে। যেমন- ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প ও বণিক সমিতি, একতা স্পোর্টিং ক্লাব ইত্যাদি।

সংঘ

বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের 'Society: Its Structure and Change' গ্রন্থে বলেন, "We define an association, as a group organised for the pursuit of an interest or group of interests in common." (যখন কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে মুষ্টিমেয় লোক সমাজবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলা হয়)।

সামাজিক নৃবিজ্ঞানী মরিস জিন্সবার্গ তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "সংঘ বা সমিতি বলতে এমন জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একতাবদ্ধ।" যেমন- ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষক সমিতি ইত্যাদি। অবশ্য ম্যাকাইভার এও বলেছেন, "Associations as means of pursuing ends." (সমিতি হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র)।

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন এবং নিমকফের মতে, "সমিতি হলো সেই সংগঠন যা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসারে এর সদস্যগণ কাজ করে।"

সংঘ

সমাজবিজ্ঞানের বিখ্যাত তাত্ত্বিক সিডনি ওয়েব বলেন, "A'continuous association of wage earners of the purpose of maintaining and improving all conditions of their working lives."

অতএব বলা যায়, সংঘ বা সমিতি হচ্ছে এমন একটি সুসংগঠিত জনসমষ্টি যার সদস্যরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কর্মরত। এরা সমাজে একই আয় ও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী গোষ্ঠী।

এটি এমন একটি প্লাটফরম (স্থানিক অথবা অস্থানিক) যেখানে লোকজন তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একত্রিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১৩ সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক

টপিক ১৩: সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক

সংঘ ও সম্প্রদায় সমাজবিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রত্যয়। এ দুটি প্রত্যয়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হলো-

১. স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে একটি এলাকার জনগণ হলো সম্প্রদায় এবং এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত দল হলো সংঘ।

২. সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রয়োজন। কিন্তু সংঘের জন্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রয়োজন নেই।

৩. সম্প্রদায় একটি স্থায়ী সংগঠন। কিন্তু সংঘের নির্দিষ্ট স্থায়িত্ব নেই।

৪. সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকার লোক হতে হয়। কিন্তু সংঘের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকার লোক হতে হয় না।

৫. সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সংঘের উদ্দেশ্য সহজে অনুমান করা যায় না।

৬. সম্প্রদায় কোনো সংগঠনের অধীন নয়। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়ের অধীনস্থ একটি সংগঠন হলো সংঘ।

৭. একজন ব্যক্তি একাধিক সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারে না। কিন্তু একজন ব্যক্তি একাধিক সংঘের সদস্য হতে পারে।

সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক

৮. সম্প্রদায়ের মধ্যে সদস্যরা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। কিন্তু সংঘের মধ্যে সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

৯. সম্প্রদায়ের মৌলিক ভিত্তি হলো- এলাকা ও সম্প্রদায়গত মানসিকতা। পক্ষান্তরে, সংঘের নির্দিষ্ট কোনো ভিত্তি নেই।

১০. একটি সম্প্রদায় সংগঠিত হওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সংঘ যেকোনো সময় সংগঠিত হতে পারে।

১১. সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জনগণের মতামতও থাকতে পারে। অন্যদিকে, সংঘের মধ্যে বিভিন্ন মত ও পথের লোকের জীবনধারা একই রকম থাকে।

১২. সম্প্রদায় কখনো সংঘ হতে পারে না। পক্ষান্তরে, সংঘ কখনো কখনো অস্থায়ী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হতে পারে।

সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একে অপরের পরিপূরক। আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণ।

সার্বিক বিবেচনায় উভয়ের গুরুত্বই অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১৪ সমাজ ও সম্প্রদায়

টপিক ১৪: সমাজ ও সম্প্রদায়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজ ও সম্প্রদায়

সমাজ ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য বা সম্পর্ক নির্ণয় করতে হলে সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। নিচে সমাজ ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য ও সম্পর্ক দেখানো হলো-

১. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে সমাজ। তাই সমাজ বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যেখানে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। অন্যদিকে, সম্প্রদায়ের সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে এবং তাদের জীবনের মৌল ও সাধারণ স্বার্থগুলো একই সাথে ভোগ করে ও একই আচার-আচরণ তথা জীবনপ্রণালিতে অভ্যস্ত হয়।

২. একটি সমাজে অনেকগুলো সম্প্রদায় থাকতে পারে। তাই সমাজের পরিধি ব্যাপক। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়ের পরিধি সমাজের চেয়ে ক্ষুদ্র। কেননা সম্প্রদায় সমাজের একটি অংশ।

৩. সমাজে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকতে পারে। যেমন- মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায় শুধু একটি জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। যেমন- মুসলিম সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায় ইত্যাদি।

সমাজ ও সম্প্রদায়

৪. মানুষের একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে সমাজ গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, জীবনের মৌল ও সাধারণ স্বার্থগুলো একই সাথে ভোগ করার জন্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

৫. সমাজের কোনো ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা আছে।

৬. সমাজের সদস্যদের ভিতর সামাজিক মানসিকতা কাজ করে। অন্যদিকে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ কাজ করে।

সমাজ ও সম্প্রদায়

৭. সমাজ রাষ্ট্র প্রদত্ত নিয়মকানুনের দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, সম্প্রদায়ের কার্যক্রম সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিধিনিষেধ মোতাবেক পরিচালিত হয়।

৮. সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। অন্যদিকে, সম্প্রদায় একটি মূর্ত প্রত্যয়।

৯. সমাজের ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দলবদ্ধভাবে বসবাস করার প্রবণতা। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়ের ভিত্তি হচ্ছে এলাকা ও সম্প্রদায়গত মানসিকতা।

১০. সমাজের ক্ষেত্রে জনসমষ্টিকে নির্দিষ্ট এলাকার অধিবাসী হতে হয় না। অন্যদিকে, সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে জনসমষ্টিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী হতে হয়।

১১. সমাজবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের জীবনধারণের আদর্শ, রীতিনীতি এক ও অভিন্ন।

১২. সমাজ হচ্ছে এক জটিল সামাজিক সম্পর্ক যা সতত পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, সম্প্রদায় সাধারণভাবে একই রকম জীবনের একটি পূর্ণবৃত্ত যা যেকোনো সংগঠনের চেয়ে সুসংহত।

অতএব বলা যায়, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনই এদের মধ্যে গুণগত ও মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। সমাজ হচ্ছে একটি ব্যাপক প্রত্যয়, যার পরিধির নির্দিষ্ট কোনো সীমানা পরিমাপ করা যায় না। অন্যদিকে, সম্প্রদায় হচ্ছে সমাজের একটি অংশ। একে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় রেখে এর সীমানা পরিমাপ সম্ভব এবং এটি সমাজেরই একটি সংগঠন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১৫ প্রতিষ্ঠানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

টপিক ১৫: প্রতিষ্ঠানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

ইংরেজিতে Institution শব্দটির বাংলা অর্থ হলো প্রতিষ্ঠান; এ ধারণা অনুযায়ী যেকোনো সংঘই হলো প্রতিষ্ঠান। যেমন-পরিবার, রাষ্ট্র এগুলোকে প্রতিষ্ঠান বলা হয়। কারণ এগুলো মানুষের দ্বারা তৈরি সামাজিক এক একটি সংগঠন। সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠান হলো কতকগুলো কার্যাবলির একটি সমন্বিত রূপ। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত কার্যাবলিকে বোঝায়। আর এ কার্যাবলি সংঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা বুঝি প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি বা সামাজিক ব্যক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের রীতি।

প্রতিষ্ঠান হলো প্রতিষ্ঠিত আচরণ। মানব আচরণের প্রতিষ্ঠিত রূপকেই প্রতিষ্ঠান বলে। অর্থাৎ এ বিশ্বে/সমাজে মানুষজন তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়; যেমন- অর্থনৈতিক প্রয়োজন, শিক্ষামূলক প্রয়োজন, পারিবারিক প্রয়োজন, ধর্মীয় প্রয়োজন ইত্যাদি। আর এ প্রয়োজনগুলো পূরণের সমাজ স্বীকৃত নিয়মগুলোই হলো প্রতিষ্ঠান।

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

সমাজবিজ্ঞানী বার্নস (H. E Barnes) তার 'Social Institution' গ্রন্থে বলেন, "যা কিছু সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সেটিও প্রতিষ্ঠান।" তিনি আরও বলেন, "সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ কাঠামোর উপাদান এবং সামাজিক নিয়মাবলি, যার মাধ্যমে মানবসমাজ সংগঠিত হয় এবং মানুষের প্রয়োজনীয় বহুমুখী সামাজিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়।" বার্নস-এর সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে-

১. প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

২. প্রতিষ্ঠান সামাজিক কাঠামোর উপাদান ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারক-বাহক বা নিয়মাবলি।

৩, প্রতিষ্ঠান মানব সমাজের সাংগঠনিক উপাদান।

৪. প্রতিষ্ঠান মানুষের বহুমুখী সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদন করে।

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট তার 'Fundamentals of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ কর্তৃক গৃহীত এমন এক স্থায়ী ব্যবস্থা যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।" জিসবার্ট আরও বলেন, "প্রতিষ্ঠান হলো এমন চাকা (Wheel) যার ওপর ভিত্তি করে সমাজ পরিচালিত হয়।" জিসবার্ট-এর সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে-

১. প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ব্যবস্থার নাম।

২. প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। 1

৩. প্রতিষ্ঠান নামক চাকার ওপর ভিত্তি করে সমাজ পরিচালিত হয়।

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট-এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন Ellwood. তিনি তার 'The Psychology of Human Society গ্রন্থে বলেন, "প্রতিষ্ঠান হলো মানুষের অভ্যাসগত কর্মপন্থা বা জীবনপ্রণালি যা সমাজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত, প্রতিষ্ঠিত ও বিন্যস্ত।" এলউডের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে-

১. প্রতিষ্ঠান মানুষের অভ্যাসগত কর্মপন্থা বা অভ্যাসগত জীবনপ্রণালি নির্দেশক।

২. প্রতিষ্ঠান সমাজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত, প্রতিষ্ঠিত ও বিন্যস্ত।

ম্যাকাইভার তার 'Society' নামক গ্রন্থে বলেন, "অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সামাজিক কার্যপ্রণালির প্রতিষ্ঠিত প্রথা, প্রক্রিয়া বা নিয়মাবলি।" তিনি আরও বলেন, "মানুষ যখন সংঘ গড়ে তোলে তখন তার পরিচালনার নিয়ম পদ্ধতি বা কার্যপ্রণালি সৃষ্টি করে।"

গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য: সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে প্রতিষ্ঠানের কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ অনুমোদিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য নানাবিধ কার্য সম্পাদন করা হয়।

২. মূলত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য।

৩. সমাজকে সুস্থ ও স্থিতিশীল রাখতে প্রতিষ্ঠান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত এবং দলগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্ব বেশি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তুলনায়।

৫. প্রতিষ্ঠান মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে দলগত কর্মের প্রতিষ্ঠিত রূপ।

৬. প্রতিষ্ঠান সামাজিক লোকাচার ও লোকরীতিকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে।

অতএব বলা যায়, সামাজিক জীবনে যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর সেগুলোই মানুষ কতকগুলো কার্যপ্রণালির মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। এ কার্যপ্রণালিগুলো সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। এ প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালিকে আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে থাকি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১৬ প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

টপিক ১৬: প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি

প্রতিষ্ঠান আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল প্রত্যয়। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। প্রতিষ্ঠান ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টি হয়েছে সমাজের সদস্যদের চাহিদা পূরণের জন্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করে। মানবসমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যেমন-রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজজীবন নিয়ত চলমান থাকে।

সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন বা বংশধরদের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজে কতকগুলো বিধিব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং এগুলো সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে জেরুজালেম আজও পবিত্র নগরী হিসেবে স্বীকৃত। রোমের পাহাড়ের মতো পবিত্র স্থানে আজও তীর্থযাত্রীদের ভিড় জমে। ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা এসব স্থানে পবিত্রতাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী একটি উপাদান।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি

সমাজবিজ্ঞানী W. G. Sumner মনে করেন, সম্পত্তি, বিবাহ, ধর্ম এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত মৌলিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ তার জীবনকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য নিজ প্রয়োজনে এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীতে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এগুলোর সাথে যুক্ত হয়। সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও আইন-কানুন। আবার সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে আছে মানুষের যুক্তিসম্মত আবিষ্কার ও সদিচ্ছা। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি উন্নত সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে Sumner মত প্রকাশ করেন।

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেস প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং ভিন্নতর ব্যাখ্যা দান করেন। তারা মনে করেন, প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছে সামাজিক অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্য থেকে। যেকোনো সামাজিক আন্দোলন অন্ততপক্ষে এক ধরনের প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটায়। এ প্রসঙ্গে নারী অধিকার আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এ আন্দোলন ছিল বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। কিন্তু কালক্রমে এ আন্দোলন একটি সুসংগঠিত রূপলাভ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন ও নারী নেতৃত্ব। পার্ক ও বার্জেস মনে করেন, এভাবে সংগঠন অভ্যুদয়ের সাথে সেগুলো পরিচালনার জন্য জন্ম নেয় নতুন নতুন আদর্শ, বিধি, পদ্ধতি ও নিয়মনীতি। অতঃপর উদ্দেশ্য অর্জিত হলে আর আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজন থাকে। এ আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘটলেও প্রতিষ্ঠানটি ঠিকই টিকে থাকে এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানকে প্রধানত নিম্নোক্ত ৫ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১. সামাজিক গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান,
২. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান,
৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,
৪. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও
৫. মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হলো-

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান | Social constructive organizations

আমরা কতকগুলো সামাজিক বন্ধন লক্ষ করি যেগুলোকে সমাজবিজ্ঞানিগণ প্রতিষ্ঠান বলেছেন। যেমন- বিবাহ ও পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান গঠিত হয়েছে সামাজিক বন্ধনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

নিচে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সামাজিক গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক. পরিবার ও বিবাহ: সমাজজীবনের মূল কেন্দ্র বলা হয় পরিবারকে। পরিবার সমাজজীবনে এমন একটি স্থান অধিকার করে আছে যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং আজীবন তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এ লক্ষে পরিবারকে সর্বজনীন মানবীয় প্রতিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। এমন কোনো লোক সমাজে নেই, যে কোনো না কোনো পরিবারভুক্ত নয়। পরিবার হচ্ছে ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের জন্য, মানসিক যাতনার উপশমের জন্য, যৌন ক্ষুধার পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য, শিশুর শিক্ষা ও লালন-পালনের জন্য সমাজজীবনের মূল কেন্দ্র। বিবাহকে সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজবিজ্ঞানীগণ। বিবাহকে সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করার পিছনে যুক্তিও রয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান বলতে যেমন সমাজের বিবিধ আচার-পদ্ধতিকে বোঝায়, তেমনি সমাজের বিবিধ আচার-পদ্ধতির মাধ্যমেই গোষ্ঠীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর ফলে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা পায় এবং পরস্পরের মাঝে বন্ধনের দ্বারা পরিবার গঠিত হয়। সুতরাং এ কার্যপ্রণালিকে সামাজিক অনুষ্ঠান বলা যায়

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

খ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্ধারণ করেন। সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কাজ হলো একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা; যার মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত ও বাস্তব, আলংকারিক ও ব্যবহারিক- উভয়রূপ উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাম্প্রতিককালে প্রত্যেক সমাজে শিক্ষাকে সুসংগঠিত আচারব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

গ. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান: সমাজস্থ মানুষের সাথে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং জীবনধারণগত বৈশিষ্ট্যের একটা যোগসূত্র রয়েছে। সমাজপ্রবাহের সাথে মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সৃষ্টি হয় তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়েছে; যথা- শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে মানুষ সমাজজীবনের ঐক্য ও মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়।

ঘ. প্রথা বা আচার প্রথা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Custom'। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন 'আচার'। সাধারণ অর্থে প্রথা বা আচার বলতে আমরা বুঝি সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি। প্রত্যেক সমাজে কতকগুলো বিশেষ প্রথা বা আচার রয়েছে যা সমাজস্থ সদস্যগণ মেনে চলেন। যেমন- পরিচিত ব্যক্তির সাথে দেখা হলে আমরা পরস্পরকে সালাম বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে দেখি।

ঙ. লোকাচার: সকলেরই কাম্য, সমাজে বসবাসকারী সবাই একটি রীতি অনুসরণ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সমাজে এমন কতিপয় রীতি আছে যেগুলো কেউ লঙ্ঘন করলে তার ওপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয় না। এ জাতীয় বিধিসমূহকে উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার লোকাচার বলে অভিহিত করেছেন।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান | Financial Institutions)

যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালির সাথে জড়িত রয়েছে তাকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রার মান অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর সমাজের রূপরেখা নির্ভর করে। সমাজে আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার জন্ম দেয়। বস্তুত অর্থনৈতিক কার্যাবলি সমাজ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যাবলি সামাজিক অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | Religious Institution

সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক মানুষ তার প্রয়োজনাদি মিটিয়ে থাকে। ধর্ম একটি মাধ্যম; যার ফলে সামাজিক মানুষ কতকগুলো নীতি ও বিশ্বাসের দ্বারা গোষ্ঠীগত হয়। আদিকাল হতেই সর্বপ্রকারের সমাজে কোনো না কোনো ধর্ম বিদ্যমান ছিল। ধর্ম প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানিগণ এমন কোনো মানবসমাজ চিন্তা করতে পারেননি। বস্তুতপক্ষে ধর্ম বলতে সাধারণ অর্থে যা বোঝায়, সমাজবিজ্ঞানিগণ তাতে একমত নন। এজন্য ধর্মের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা বা সকলের গ্রহণীয় হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান | Political Institution

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় সামাজিক দল বা গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে একটি সুসংহত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ধীরে ধীরে আবির্ভাব হয় রাষ্ট্রের। মানুষ যখন সামাজিক জীব হিসেবে বাস করতে লাগল এবং সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে লাগল, তখন মানুষ তার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হতে লাগল এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সে অধিকার ও কর্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। যেমন- সরকার একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান | Psychological Institution

মানুষের একঘেয়েমি জীবন থেকে প্রশান্তি লাভের জন্য এবং মানসিক তৃপ্তি লাভের জন্য বিশেষ ধরনের আচরণ ও বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী কতকগুলো রীতিনীতি পালন করতে দেখা যায়। যেমন- খেলাধুলা, যাত্রা, থিয়েটার, চলচ্চিত্র, বনভোজন, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদসংক্রান্ত কার্য সম্পন্ন হয়। এসব প্রতিষ্ঠান মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। সমাজবিজ্ঞানিগণ এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষ একদিকে যেমন বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেবার সুযোগ পায়, অন্যদিকে সমাজস্থ মানুষ সামাজিক তৃপ্তি লাভ করারও সুযোগ লাভ করে।

বিশাল এক ভালবা

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১৭ লোকাচার ও লোকরীতি

টপিক ১৭: লোকাচার ও লোকরীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

লোকাচার ও লোকরীতি

সমাজ সম্পর্কিত মৌল প্রত্যয়গুলোর মধ্যে লোকাচার ও লোকরীতি (Folkways and Mores) গুরুত্বপূর্ণ মৌল প্রত্যয়।

ম্যাকাইভার (MacIver) বলেন, "Folkways are the recognized or accepted ways of behaving in society." (ব্যবহার এবং আচরণের স্বীকৃত এবং গৃহীত পন্থা পদ্ধতি হচ্ছে লোকাচার)।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রথা মেনে চলে এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নিয়মরীতি অনুযায়ী আচার-আচরণ করে। সমাজবিজ্ঞানীরা এমন একটি ব্যাপক প্রত্যয় উদ্ভাবন করেছেন, যা সমাজসৃষ্ট নানা আচরণ, প্রথা, ব্যবহারপ্রণালি, জীবনধারা ইত্যাদিকে লোকাচার প্রত্যয়টির অন্তর্ভুক্ত করে।

সামনার (Sumner) তার 'Folkways' গ্রন্থে Folkways এবং Mores-কে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "লোকাচার সমাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বা গতিধারায় জন্মলাভ করে।"

লোকাচার ও লোকরীতি

অনেক সময় অচেতনভাবে লোকাচার সৃষ্টি হয়। সামাজিক নতুন অবস্থার প্রেক্ষাপটে লোকাচার খাপ খাইয়ে নেয় এবং লোকাচার বেশ গতিশীল ভূমিকা পালন করে। সব ধরনের সমাজের সকলের জীবনই লোকাচার দ্বারা কমবেশি নিয়ন্ত্রিত। লোকাচারের কতিপয় দিক অবশ্য ধর্ম, দর্শন, নীতি বা প্রজ্ঞা দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। সমাজে বসবাসরত মানুষের স্বীকৃত ব্যবহারপ্রণালি লোকাচার বলেই পরিচিত। শিষ্টাচার, আদব-কায়দা ইত্যাদি আচরণবিধিও লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য বিভিন্ন সমাজে লোকাচার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে এবং সময়ের ব্যবধানে একই সমাজের লোকাচার তার ধরন পাল্টাতে পারে।

লোকাচার ও লোকরীতি

ম্যাকাইভারের মতে, অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হচ্ছে 'ব্যবহার নিয়ন্ত্রক'। যখন লোকরীতি বা লোকাচারকে কেবল ব্যবহারবিধি না মনে করে ব্যবহার নিয়ন্ত্রক বলে মনে করা হয় তখন তা হয় Mores বা অবশ্য পালনীয় লোকরীতি।

এটি এমন একটি আদর্শ যার শক্তিশালী নৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। লোকাচার ও লোকরীতির মধ্যে একটি মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। কারণ লোকরীতি হচ্ছে সমাজের আদর্শ বা মানসম্পন্ন আচরণ, যা সমাজের সদস্যদের জন্য অবশ্য পালনীয় লোকাচার; লোকরীতি মূলত গোষ্ঠীর অভিভাবকের কাজ করে। কোনটা ঠিক বা কোনটা ঠিক নয়, কোনটা করা উচিত বা কোনটা করা অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে লোকরীতি মানব চরিত্র নিয়ন্ত্রণে এক সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ লোকরীতি কাউকে কোনোকিছু করতে বা না করতে সামাজিকভাবে বাধ্য করে।

লোকাচার ও লোকরীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ধরা যাক, আমাদের গ্রামীণ সমাজে মহিলাদের নাকে নাকফুল (গহনা) পরা লোকাচার। তবে না পরলেও চলে। কিন্তু বিবাহিত মহিলাদের নাকে নাকফুল পরতে হয়। আবার লোকরীতির কারণে বিধবাদের গহনা পরা থেকে বিরত থাকতে হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১৮ সামাজিক গতিশীলতা

টপিক ১৮: সামাজিক গতিশীলতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক গতিশীলতা

সামাজিক গতিশীলতার প্রক্রিয়া বলতে একটি বিশেষ পদ্ধতি বা কার্যক্রমকে বোঝায়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি সমাজের এক পদমর্যাদা থেকে অন্য পদমর্যাদায় পদার্পণ করে। এ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি সমাজের উচ্চপদ স্থানে আসীন হতে পারে আবার পদস্থান হারিয়ে নিচেও নামতে পারে। মোটকথা সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক গতিশীলতা। যখন ব্যক্তি বা দল একটি সামাজিক মর্যাদা থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি বা মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে অন্য সামাজিক মর্যাদায় চলে যায় তখন তাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে উচ্চশ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি। সম্পদ, ক্ষমতা, বংশমর্যাদা, পেশা, শিক্ষা এসবের ভিত্তিতে সমাজে স্তরবিভাগ দেখা যায়। মানুষের এ স্তরবিভাগ চিরস্থায়ী নয়। এ স্তর পরিবর্তনের ফলে উচ্চস্তরের মানুষ নিম্নস্তরে, আবার নিম্নস্তরের মানুষ উচ্চস্তরে যেতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনকেও সামাজিক গতিশীলতা বলা হয়। সামাজিক গতি ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী উভয়ই হতে পারে। কেউ সমাজে উচ্চমর্যাদা লাভ করে আবার কারও সামাজিক মর্যাদা লোপ পায়।

সামাজিক গতিশীলতা

সমাজের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে উচ্চশ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি। সম্পদ, ক্ষমতা, বংশমর্যাদা, পেশা, শিক্ষা এসবের ভিত্তিতে সমাজে স্তরবিভাগ দেখা যায়। মানুষের এ স্তরবিভাগ চিরস্থায়ী নয়। এ স্তর পরিবর্তনের ফলে উচ্চস্তরের মানুষ নিম্নস্তরে, আবার নিম্নস্তরের মানুষ উচ্চস্তরে যেতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনকেও সামাজিক গতিশীলতা বলা হয়। সামাজিক গতি ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী উভয়ই হতে পারে। কেউ সমাজে উচ্চমর্যাদা লাভ করে আবার কারও সামাজিক মর্যাদা লোপ পায়।

সামাজিক গতিশীলতার সংজ্ঞায় সরোকিন বলেছেন, "ব্যক্তি বা দলের একটি সামাজিক মর্যাদা হতে বা সামাজিক মূল্যবোধ ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সীমা থেকে অন্য সীমারেখায় পরিবর্তনের চক্রায়নকে সামাজিক' গতিশীলতা বলে।" (By social mobility is understood any transition of an individual are social object of value anything that has been created or modified by human activity from one social position to another.-Sorokin. 1964:25)

সামাজিক গতিশীলতা

ড্রেসলার বলেন, “সামাজিক গতিশীলতা হচ্ছে ব্যক্তির একটি সামাজিক মর্যাদা থেকে অন্য সামাজিক মর্যাদায় স্থানান্তরিত হওয়া।”

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিমকফ বলেছেন, "সামাজিক গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন, যা ঊর্ধ্বমুখী কিংবা নিম্নমুখী দুই-ই হতে পারে।"

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক গতিশীলতা হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা দলগতভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে গমন। এটি সমাজ কাঠামো ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন।

সামাজিক গতিশীলতা

সামাজিক গতিশীলতার শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক গতিশীলতাকে আনুভূমিক (Horizontal) ও উল্লম্বি (Vertical)-এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে সামাজিক গতিশীলতার দুটি প্রকরণ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

আনুভূমিক গতিশীলতা | Horizontal Mobility

একই সামাজিক স্তর থেকে অনুরূপ সামাজিক স্তরে যাওয়া-আসাকে আনুভূমিক গতিশীলতা বলা হয়। আনুভূমিক গতিশীলতা সম্পর্কে গ্রিন বলেছেন, "আনুভূমিক গতিশীলতা বলতে সব ধরনের চলনশীলতাকে বোঝায়। অসংগঠিত সামাজিক শ্রেণির পরিবর্তন যেমন কোনো একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া, অথবা বেতন কিংবা পদমর্যাদার পরিবর্তন ছাড়াই কোনো চাকরি গ্রহণ করে কোথাও যাওয়া।" সমাজে শ্রেণি, বর্ণ বা মর্যাদাগত যে বিন্যাস রয়েছে সেখানে একই শ্রেণি, বর্ণ বা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কোনো সামাজিক পরিমণ্ডলে অনুরূপ শ্রেণি, বর্ণ বা মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্য হতে পারে। এক সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে অন্য সামাজিক পরিমণ্ডলে একই সামাজিক স্তরের ব্যক্তির স্থায়ী গমনকে আনুভূমিক গতিশীলতা বলে। যেমন- একজন শিক্ষক যদি স্কুল পরিবর্তন করে অন্য স্কুলে চাকরি করেন তবে আনুভূমিক গতিশীলতা হবে।

সামাজিক গতিশীলতা

সামাজিক গতিশীলতার শ্রেণিবিভাগ

উল্লম্বি গতিশীলতা | Vertical Mobility

উল্লম্বি গতিশীলতা হচ্ছে উঁচু-নীচু স্তরে বিভক্ত সমাজে কোনো নির্দিষ্ট স্তর থেকে অন্য স্তরে (উঁচু কিংবা নীচু) ব্যক্তির স্থায়ী গমন। এ ধরনের অবস্থা মর্যাদাগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এ উঁচু-নীচু শ্রেণিতে গমন মানুষের ব্যক্তিজীবনে যেমন গভীর প্রভাব ফেলে, তেমনি সমাজজীবনেও এর প্রভাব কম নয়। উল্লম্বি গতিশীলতা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী Merrill তার 'Society and Culture' গ্রন্থে বলেছেন, "উল্লম্বি গতিশীলতা হচ্ছে শ্রেণিবিন্যাসের উঁচু অথবা নীচু অবস্থানে গমন করা।" ড্রেসলারের মতে, "সামাজিক গতিশীলতা বলতে মূলত উল্লম্বি গতিশীলতাকেই বোঝায়। এটি হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী চলনশীলতা।" যেমন- কেরানির চাকরি থেকে কারও সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি কিংবা স্কুলের কেরানির চাকরি হতে কলেজের শিক্ষক হিসেবে অভিগমন।

সামাজিক গতিশীলতা

সামাজিক গতিশীলতার শ্রেণিবিভাগ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ১৯ সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

টপিক ১৮: সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

সামাজিক গতিশীলতার পিছনে কয়েকটি কারণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ কারণগুলো হচ্ছে- শিল্পায়নের প্রভাব, নগরায়ণের প্রভাব, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ইত্যাদি। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো-

শিল্পায়নের প্রভাব: সাধারণ অর্থে শিল্পায়ন বলতে কলকারখানা স্থাপন ও সেগুলোর প্রসার লাভকে বোঝায়। শিল্পায়ন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদিত হয়। আধুনিক সমাজ বলতে সাধারণত শিল্পায়িত সমাজকেই বোঝায়। শিল্পায়ন মানেই সভ্যতার অগ্রগতি। শিল্পায়নের প্রভাবে মানুষের অর্থনৈতিক মান বেড়ে যায়। সমাজে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটলে মানুষ কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা রাখতে পারে না। শিল্পভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় তার অনুপ্রবেশ ঘটে। এতে তার পেশা, আয়, মূল্যবোধ ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটে। এভাবে শিল্পায়নের মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ছে।

সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

নগরায়ণের প্রভাব: শিল্পায়নের সাথে নগরায়ণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নগরের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে। নগর বলতে এমন একটি সীমিত এলাকা বোঝায়, যেখানকার জনগোষ্ঠী অকৃষিজ পেশা বা কাজকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। নগরায়ণের ফলে মানুষ ক্রমাগত গ্রাম থেকে নগরের দিকে ধাবিত হয়। মানুষের মনে নগর মানসিকতা গড়ে ওঠে। নগরে বসবাসকারী মানুষের জীবনপ্রণালি গ্রামীণ জীবনপ্রণালি থেকে ভিন্নতর। নগর মানসিকতা নগরবাসীর কাজেকর্মে, আচরণে-চিন্তায়, এককথায় মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটায়। বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকায় নগরবাসীর আর্থসামাজিক তথা মর্যাদাগত পরিবর্তন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এভাবে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন: সমাজব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাব্যবস্থার অনবরত পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আচরণবিধি, চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথেই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এভাবে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ায়।

মূলত উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পৃথিবীর সব সভ্যতাই শক্তিশালী আর্থিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সভ্যতার আদি পর্বে কৃষি এবং ব্যবসায় ছিল অর্থনীতির মূলভিত্তি। তখন উৎপাদন পদ্ধতিতে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে গোষ্ঠী মালিকানা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থাও সমাজে বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। এক সময় আবার ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা নেতার অধীনে দাসনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি চালু হয়। দাসরা ছিল উৎপাদনের হাতিয়ার এবং তাদের প্রভুর সম্পত্তি। দাসদের বিদ্রোহের ফলে দাস সমাজ ভেঙে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়।

সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

সামন্তপ্রভু ভূমি দাসদের দ্বারা ভূমি চাষ করাত। সামন্তপ্রভু ছিল ভূমির মালিক। সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানার ফলে ব্যক্তির হাতে পুঁজি সঞ্চিত হতে থাকে এবং পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ার ব্যক্তিমালিকানাধীন। এ ব্যবস্থায় সম্পত্তির অসম বণ্টনের ফলে সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সংঘাতের ফলে কোনো কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের এ পর্যায়গুলো সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন: আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এর মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে চলেছে। ফলে সমাজে নতুন নতুন পেশা সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষের জীবনযাত্রা অধিকতর গতিশীল হয়ে উঠছে।

আধুনিক যুগ হচ্ছে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের যুগ। শিল্পের প্রসারের সাথে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের গতিও বেড়েছে। শিল্পের এ অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের সমাজও এগিয়ে চলেছে। এদেশের শহর, নগর, বন্দরে গড়ে উঠছে শিল্পকারখানা। যান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি হচ্ছে। পেশাগত মর্যাদার সাথে সাথে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। মানুষ পল্লি ছেড়ে ভিড় করছে শহর-বন্দরে। সে সাথে গ্রাম্য সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথাও লোপ পাচ্ছে।

এদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন- জমিদারি ব্যবস্থা বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে বংশগত মর্যাদার পরিবর্তে মানুষের শিক্ষা, পেশাগত মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজে মান, সম্মান, আভিজাত্য ও যশ বাড়াচ্ছে। ফলে পল্লি এলাকায় আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন হচ্ছে। এসব বিবেচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশেও সামাজিক গতিশীলতা ক্রিয়াশীল রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ২০ সামাজিক নিয়ন্ত্রনের ধারণা

টপিক ২০: সামাজিক নিয়ন্ত্রনের ধারণা

This Topic is important for

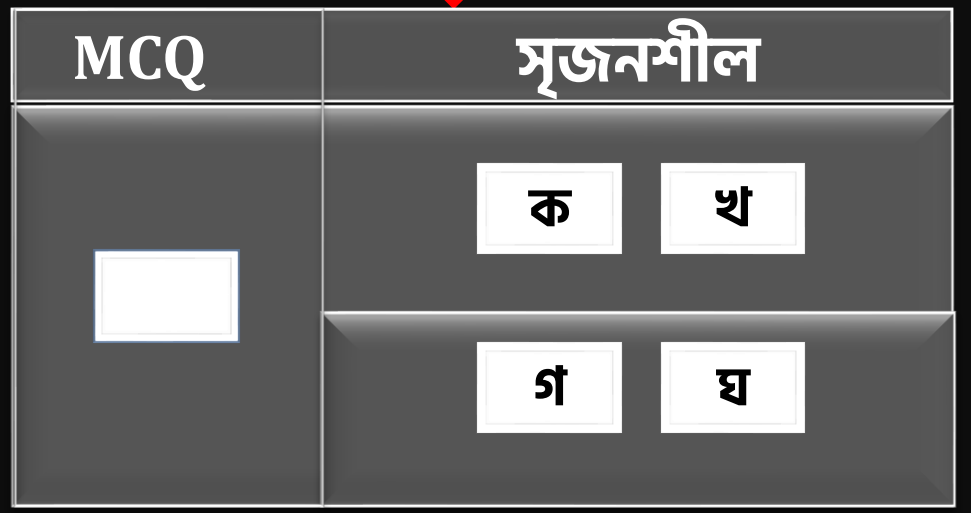

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের ধারণা

সমাজ কর্তৃক গৃহীত এমন সব পন্থা, ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়াকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয় যার সাহায্যে ব্যক্তির কাজকর্ম, তার চলন-বলন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সমাজ কর্তৃক ঈপ্সিত ধারায় পরিচালিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ- দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। অর্থাৎ সমাজের খারাপ মানুষকে শাসন করা এবং উত্তম ও ভালো চরিত্রের অধিকারীকে পুরস্কৃত করা ইত্যাদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ।

সমাজবিজ্ঞান ডেভিড পেপোনো (David Popenoe) তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Social control is any process that conditions or limits the actions of people to make them want to conform to social norms most of the time." (যেকোনো প্রক্রিয়ার নামই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যা (অধিকাংশ সময়ে) সামাজিক নিয়মকানুন ও রীতিনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে)।

রবার্টসন (Robertson) তার 'Sociology' নামক গ্রন্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Social control is the mechanisms & processes by which a society ensures that its members generally behave in expected approved ways." (সমাজের সদস্যবৃন্দ সমাজস্বীকৃত পন্থায় কাঙ্ক্ষিত আচরণ করবে এমন নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াই হচ্ছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ)।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী মেটা স্পেন্সার (Metta Spencer) তার 'Foundations of Modern Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Social control is the process by which members of a group support desired forms of behaviour and discourage undesired forms." (সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সদস্যবৃন্দ কাঙ্ক্ষিত আচরণের সমর্থন এবং অবাঞ্ছিত আচরণকে নিরুৎসাহিত করে)।

ম্যাকাইভারের মতে, ‘‘সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি পন্থা, যার মাধ্যমে গোটা সামাজিক ব্যবস্থা সুসংহত ও নিজেই পরিচালিত হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী টি.বি. বটোমোর (Bottomore) বলেন, সমাজজীবনে ব্যক্তির কিংবা গোষ্ঠীর আচরণ দুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে- বলপ্রয়োগ দ্বারা, অথবা সমাজস্থ সবাই বাধ্যতামূলক 'আচরণের নিয়ম' হিসেবে কমবেশি মান্য করতে প্রস্তুত এমন মূল্যবোধ ও নীতিমানের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞানীরা 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। এতে বৃহত্তর সমাজের অখণ্ডতাকে অটুট রাখতে মূল্যবোধ ও নীতিবোধের কাছে আবেদনের মাধ্যমে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এবং গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরসন অথবা উত্তেজনার প্রশমন করতে চাওয়া হয়। আবার যেসর ব্যবস্থার দ্বারা এসব মূল্যবোধ ও আদর্শ সংবাহিত ও সঞ্চারিত হয়ে থাকে সেই মাধ্যমগুলো বোঝাতেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের ধারণা

কেন ব্রাউনের (Ken Brown) মতে, “সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে মূল্যবোধ এবং আদর্শকে অনুসরণ করতে প্ররোচিত করে।" (The process of persuading or forcing to conform to values & norms.)

সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড ড্রেসলার (Dressler) -এর মতে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সেই শক্তি যা ব্যক্তিকে সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ও স্বীকৃত পন্থায় আচরণ করতে উৎসাহিত করে।

সমাজবিজ্ঞানী রস বলেন, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে একটি বিশেষ ব্যবস্থা বলা যায়।” তার মতে, “সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দলের ব্যবহারের সাথে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে থাকে।"

অতএব বলা যায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এমন সব প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা, যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক মূল্যবোধ এবং রীতিনীতি অনুযায়ী আচরণের প্রতি সমর্থন জোগায় এবং সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থি আচরণকে নিরুৎসাহিত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ২১ সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

টপিক ২১: সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহনসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

পরিবার: পরিবারের অন্যতম কাজ হলো সন্তান-সন্ততিকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উপায়ে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা। পরিবারে ব্যক্তি শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা পায়। বস্তুত ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিবার নামক অনানুষ্ঠানিক বিদ্যা গৃহেই শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব বলা যায়, পরিবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন। মা

বিবাহ: একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো বিবাহ। বিবাহ মানুষের সামাজিক জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। যৌনতার মতো সহজাত প্রবৃত্তি এবং সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা ও ভাবাবেগগত আচরণ বিবাহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে সমাজে ভারসাম্য টিকে থাকে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

ধর্ম: অতিপ্রাকৃত শক্তি সবকিছু জানে, সবকিছু দেখে এবং যে সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করবে তাকে প্রকৃত ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ফাঁকি দিতে পারে না। অতএব ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শক্তিশালী বাহন। কারণ জনমত, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় আইনকে হয়তোবা ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু ধর্ম বা অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। ধর্ম মানুষের লোভ-লালসা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে।

রাষ্ট্র: যেকোনো রাষ্ট্রেরই প্রধান দায়িত্ব হবে সমাজের আইনশৃঙ্খলাসহ সার্বিক শান্তি বজায় রাখা। রাষ্ট্র একটি আধুনিক প্রত্যয়। এটি শক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আইন: আইন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন। প্রথমত, আইন জনসাধারণকে অসামাজিক কিছু করা থেকে বরত থাকতে আবেদন জানায়। দ্বিতীয়ত, আইন কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে জনসাধারণকে কিছু করতে আবেদন জানায়। এভাবে আইনবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং আইনানুযায়ী কর্তব্য পালন করে যাওয়াই আইনের শিক্ষা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

জনমত : সামাজিক নিয়ন্ত্রণে জনমতের ভূমিকা খুবই কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রামীণ সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সমাজে অতি নিন্দনীয় কাজ করলে সেখানে জনমত তাকে বয়কট করতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী E. A. Ross জনমতকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিশালী বাহন হিসেবে উল্লেখ করেন। জনমতের রায় খুবই শক্তিশালী হয়। জনমতের ভয়ে মানুষ তার আচরণ সংযত করে এবং বিপথ থেকে সুপথে ফিরে আসে। জনমত যেমন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কার্যাবলিকেও নয়ন্ত্রণ করে। অতএব সমাজ নিয়ন্ত্রণে জনমতের ভূমিকা খুবই কার্যকর।

গণমাধ্যম : গণমাধ্যম সমাজের গলদ, অন্ধবিশ্বাস, অনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই বলা যায়, সমাজ নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা বেশ ফলপ্রসূ। তবে গণমাধ্যমসমূহের মধ্যে সংবাদপত্রের ভূমিকা বেশি কার্যকরি।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

উৎসব বা অনুষ্ঠান: মানুষের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। জীবন কাটে নানাবিধ উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং মরণোত্তরকালের আত্মার শান্তি কামনা, সবই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন কোনোকিছু গ্রহণ করে বা কাজ করে তখন সেসব কাজকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ আচার-অনুষ্ঠানে থাকে কিছু নিয়মরীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কাজ হওয়ার সময় ওইসব নিয়মরীতি, মূল্যবোধের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি বেড়ে যায়, যা তার আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব উৎসব বা অনুষ্ঠান সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন।

শিল্পকলা : শিল্পকলা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। কারণ নানাভাবে জাতির পরিচয় তুলে ধরে। শিল্পকলার চলমান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসব শিল্পকলা সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি সাধারণ আবেগ ও চেতনা জাগ্রত করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

পৌরাণিক কাহিনি: কল্পনাশ্রয়ী গল্পকে পৌরাণিক কাহিনি বলা হয়। সমাজজীবনে তথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পৌরাণিক কাহিনির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পৌরাণিক কাহিনি বানোয়াট হলেও তাতে উপদেশ, পাপীর দুর্গতি, পুণ্যবানের সৌভাগ্য, মিথ্যার পরাজয়, সত্যের জয় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শিক্ষার উপাদান কাজ করে।

প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি: সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ সামাজিক প্রথা, লোকাচার এবং লোকরীতি মানুষকে সমাজ-আকাঙ্ক্ষিত পন্থায় গড়ে তোলে। সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে আমাদেরকে সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি মেনে চলতে হয় এবং এ শিক্ষা আমরা শৈশব থেকেই লাভ করি।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা: কোনোকিছু করার ওপর নিষেধ আরোপকে নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবু (Taboo) বলা হয়। আদিম সমাজে ট্যাবুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিচিত্র ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী আদিম জনগোষ্ঠী যখন বিশ্বাস করেছে, এ কাজ করলে তাদের শিকার ভূমিতে শিকার মিলবে না, রোগ মহামারিতে জীবননাশ হবে ইত্যাদি। তখন তারা ওইসব কাজের ওপর ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত। এভাবে ট্যাবু ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ তথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

স্লোগান: একত্রিত করাই স্লোগানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সমাজের মানুষের মতানৈক্য দূর করে একত্রিত করার জন্য স্লোগান সৃষ্টি করা হয়। যেমন- 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' একাত্তরের ৭ মার্চ জাতির জনকের ঐতিহাসিক ভাষণ, এমন গর্জে ওঠা স্লোগানের মাধ্যমে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণিকে এক হওয়ার ডাক দেওয়া হয়। ফলে সমাজের একটা শ্রেণির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

মহান ব্যক্তিত্ব: সমাজ নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিবিশেষের আদর্শ খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, আদর্শবাদী শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ধর্মপুরুষ সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। ন্যায়নীতি ও আদর্শের প্রতীক এসব ব্যক্তির জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ তার আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনসমূহ

গ্রাম, সম্প্রদায় বা মহল্লা: সম্প্রদায়গত মানসিকতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সম্প্রদায়গত মনমানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে একটা জনপদ বা জনগোষ্ঠী। এদেরকে সম্প্রদায় বলা যেতে পারে। মূলত বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই এক একটি সম্প্রদায়।

শাস্তি ও শিক্ষা: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যতসব পদ্ধতি বা ভূমিকা রয়েছে তার মধ্যে শাস্তি ও শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতামূলক আচরণ থেকে সমাজকে সংশোধন করা যায়। তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বহু ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ২২ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী পদ্মা নদী তীরবর্তী একটি গ্রামের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র। তারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং একে অপরকে সাহায্য করে। তারা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। যুগ যুগ ধরে এ গ্রামের জেলেরা অভিন্ন আদর্শ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সহযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করছে।

ক. লোকরীতি কী?

খ. 'সামাজিক স্তরবিন্যাস সর্বজনীন।'- বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে জনগোষ্ঠী তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মৌল প্রত্যয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের সাথে সমাজের মৌলিক পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ২ মুকুল একটি প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করে। তাদের এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মতের অমিল থাকলেও নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণে তারা সমষ্টিগতভাবে একতাবদ্ধ। পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। মানুষগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক জটিল জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

ক. সমাজের ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন কোনটি?

খ. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল মুকুলের এলাকাটি কোনটিকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যয়টির সাথে সম্প্রদায়ের পার্থক্য আলোচনা কর।

[ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২১; কু. বো. '২১; ব. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ৩। একটি গ্রামের কিছু যুবকরা বিভিন্ন রকম প্রয়োজন মেটানোর জন্য 'সূর্য ক্লাব' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। তারা একত্রিত হয়ে ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে একটি সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলে। অপরদিকে, পার্শ্ববর্তী নদীর পাশে একটি গ্রামে স্থান ও মানসিকতা এই দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অন্য একটি জনপদ। এক্ষেত্রে তাঁতি, ঋষি, জেলে এদের কথা চলে আসে।

ক. প্রতিষ্ঠান কী?

খ. মেধা কোন ধরনের সংস্কৃতি? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে 'সূর্য ক্লাব' নামের সংগঠনটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন প্রত্যয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত প্রত্যয় দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

টপিক – ২৩ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- সকল বোর্ড '১৬]

ক. মানুষ খ. সংস্কৃতি

গ. সম্প্রদায় ঘ. সমাজ

'সমাজ' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক. Socius খ. Social

গ. Society ঘ. Communit

আকারের দিক থেকে কোনটি বৃহৎ? [সকল বোর্ড '২৩]

ক. সম্প্রদায় খ. সংঘ

গ. সমাজ ঘ. দল

সমাজ যে ধরনের সংগঠন- [সকল বোর্ড '১৯]

ক. সেবামূলক খ. আর্থিক

গ. মানবীয় ঘ. রাজনৈতিক

যখন একাধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে কী বলে? [সকল বোর্ড '১৮]

ক. সংঘ খ. সমাজ

গ. সম্প্রদায় ঘ. গোষ্ঠী বা দল

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

'সমাজ অর্থ সহযোগিতা' উক্তিটি কার? [সকল বোর্ড '২২]

ক. ডেভিড পোপিনো
খ. ম্যাকাইভার
গ. শেফার
ঘ. জিন্সবার্গ

সমাজবিবর্তন ধারায় লেনেছি প্রদত্ত প্রথম স্তরটির নাম কী? [সকল বোর্ড '২৩)

ক. আদিম সাম্যবাদী সমাজ
খ. সরল সমাজ
গ. বন্যদশা
ঘ. শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজ

কোন সমাজে খাদ্যের নিশ্চয়তা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে? [সকল বোর্ড '২৩]

ক. কৃষি সমাজে
খ. পশুপালন সমাজে
গ. উদ্যান সমাজে
ঘ. শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজে

হেনরি মর্গানের মতে সমাজ বিবর্তনের স্তর কয়টি? [সকল বোর্ড '২১]

ক. ৩
খ. ৪
গ. ৫
ঘ. ৬

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

কখন নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা হয়?

ক. খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ অব্দের পূর্বে
খ. খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দের পূর্বে
গ. খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের পূর্বে
ঘ. খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের পূর্বে

নব্য প্রস্তরযুগকে নবোপলীয় বিপ্লব নামে কে আখ্যা দেন?

ক. স্পেন্সার
খ. ডুর্খেইম
গ. ভি. গর্ডন চাইল্ড
ঘ. ওয়েবার

লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হয় কোন যুগে? [সকল বোর্ড '১৫]

ক. প্রাচীন প্রস্তর যুগ
খ. ব্রোঞ্জ যুগ
গ. নব্য প্রস্তর যুগ
ঘ. লৌহ যুগ

সমাজবিজ্ঞানের ধারাগুলো হলো-

i. আদিম সমাজ
ii. পশুপালন সমাজ
iii. কৃষি ও শিল্প সমাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

THANK YOU